রমাপদ চৌধুরী

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ঋণ

১

আপনারা অনেকেই হয়তো লক্ষ করেন নি, আজকের খবরের কাগজে মাত্র পাঁচ লাইনের একটি ছোট্ট শোক-সংবাদ বেরিয়েছে। নিমাপুরের রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাওয়ের মৃত্যুর খবরটা যদি-বা আপনাদের চোখে পড়ে থাকে, তা হলেও নিমাপুর জায়গাটা কোথায় ভেবে ভেবে আপনারা কোন কূলকিনারা পান নি। না পাবারই কথা, কারণ মানচিত্রের গায়ে এখন আর নিমাপুর নামটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু নিমাপুর সত্যিই এক সময় ছোট একটা স্টেট ছিলো। বিহার আর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে মাত্র বাইশখানা গ্রাম নিয়ে ছিলো নিমাপুর রাজ্য। এবং একজন রাজাও ছিলেন সে-রাজ্যের। তাঁরই নাম ছিলো রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাও—যিনি সাতষট্টি বছর বয়সে অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন গত পরশু, যাঁর মৃত্যু-সংবাদ আজকের খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে—কিন্তু মাত্র পাঁচ লাইনে।

বিনয়েন্দ্র সিংহরাওয়ের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার একবার আলাপ হয়েছিলো। ঘটনাচক্রে না বলে, বলা উচিত দুর্ঘটনাচক্রে।

বোধ হয় মৃত্যুর পর শিব হওয়ার বাসনা ছিলো আমার পিতামহের, তাই বার্ধক্যে বানপ্রস্থ না গিয়ে বারানসীতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এদিকে আমার বাবার বদলীর চাকরি ছিলো, কোথাও দু দণ্ড তিষ্ঠোতে পেতেন না, টহল দিয়ে বেড়াতে হতো তাঁকে সারা ভারতবর্ষ। তাই ঠাকুরদার কাছে থেকেই আমি পড়া-শুনো করতাম।

কাশীর বাঙালীটোলায় একখানা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন দাছু, আর আমি প্রতিদিন সাইকেলে করে কলেজে যাতায়াত করতাম।

অর্থাৎ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে আমি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি, সেটাই আমার ফাইনাল ইয়ার। পরীক্ষার তখনও বেশ কয়েকমাস দেরি আছে।

আমরা কয়েক বন্ধু—আমি, শিউপ্রসাদ, বিশ্বনাথন আর গুরুমুখ সিং—সকলেই একসঙ্গে সাইকেল চালিয়ে ফিরতাম ছুটির পর।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে রবিন মাইতির একটা সাইকেল সারানোর দোকান ছিলো, সেখানে আমরা চারবন্ধু আমাদের সাইকেল ক-খানা জমা রেখে বেতের ক্যারিয়ার-বক্স থেকে গামছা আর লুঙি নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে নেমে যেতাম একেবারে গঙ্গায়, জলের ওপর-পিঠে সারাদিন রোদ্দুর পাওয়ায় ঈষৎ তাপ থাকতো বটে, কিন্তু বেশ খানিকটা সাঁতার কাটলেই গরমের দিনের সব ঘাম মুছে যেতো, সব ক্লান্তি উবে যেতো, তারপর সেই মৃত্নু মৃত্নু ঠাণ্ডা বাতাস···সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে ছুচারটে তারা ফুটতো, ভাঙা এক টুকরো চাঁদ উঁকি দিতো, কখনও বা অমাবস্যায় অদূরের মণিকর্ণিকার ঘাটে ছু একটা চিতা জ্বলতো দাউদাউ করে···আর আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকতাম।

সে দিনগুলোর কথা ভাবলেও রোমাঞ্চ জাগে। বিশেষ করে সেই দিনটির কথা—যেদিন রাজা বিনয়েন্দ্র সিংহরাওয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। পরিচয় হয়েছিলো—ঘটনাচক্রে নয়, ছুর্ঘটনাচক্রে।

তারিখটা মনে নেই, বারটা মনে আছে। বুধবার। মনে আছে, তার কারণ, বুধবারেই আমাদের একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হতো। দশাশ্বমেধ ঘাটে সেদিন স্নানযাত্রীর ভিড় ছিলো বিকেলের দিকে।

অনেকেই তখন ডুব দিচ্ছে ঘাটে, দু-কানে আঙুল দিয়ে কি সব মন্ত্র বিড়বিড় করছে, এমন সময় হঠাৎ একটা হইহই চিৎকার! কেন চেঁচাচ্ছে সকলে, প্রথমটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি আধ-মানুষ জলে দাঁড়িয়ে এক-হাত ঘোমটা-টানা এক মহিলা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদছে, আর জলের ওপর থাবড়া মেরে মেরে 'বাবুয়া' 'বাবুয়া' বলে চেঁচাচ্ছে।

আর সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়লো এক ধারে দাঁড় করানো একটা নৌকোর তলা থেকে একটা বাচ্চা ছেলের মুখ এক-বার করে ভেসে উঠছে, আর বাঁচবার চেষ্টায় সে যতবার হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠতে যাচ্ছে ততবার নৌকোর গায়ে তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে, আবার জলে ডুবে যাচ্ছে সে।

জলকে আমার ভয় ছিলো না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কেন যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম, আজও জানি না। বাবুয়ার মা কাঁদছিলো বলে? লোকগুলো হইহই করছিলো, কিন্তু কেউই ছেলেটিকে খুঁজে পাচ্ছিলো না বলে? না কি আমার মনে মুহূর্তের জন্য কোন শিভালরি উঁকি দিয়েছিলো? জানি না। আমি শুধু একসময় আবিষ্কার করলাম, আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি জলে। আমার শুধু মনে হলো, ছেলেটিকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু ঘাটের ওপর থেকে ছেলেটিকে যত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিলো, সাঁতার কেটে নৌকোটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাকে আর তত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটা জায়গায় শুধু খানিকটা জলের ভুরভুরি উঠছে দেখে সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কই? দু-তিনবার ডুব দিয়েও তার হদিস পেলাম না। তবে কি নৌকোর ওপারে চলে গেছে ও? নৌকোর নীচে চাপা পড়ে গেছে? হঠাৎ আমার বুকটা ভয়ে আঁতকে উঠলো। এই প্রথম মনে হলো, যেন আমার নিজেরই কোন

আত্মীয়, কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু মারা যাচ্ছে। বাঁচবার চেষ্টা করছে সে, অথচ···ভাবলাম, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ওকে বাঁচাবোই!

আরেকবার ডুব দিতেই হঠাৎ কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরলো জলের ভেতর থেকে। একটা ভারী পাথরের মতো, আমি পা টেনে তুলতে পারছি না। একটা আসুরিক দস্যুর শক্তি দিয়ে সে আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। কি বিশ্রীভাবে, বেকায়দায় ধরেছে সে আমার একটা পা। আমি জলের ওপর ভেসে উঠতে পারছি না, আমি তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে ডুব দিতে পারছি না। হঠাৎ, হঠাৎ আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মৃত্যুর মতো অন্ধকার ঘনিয়ে এলো আমার চোখে। আমি প্রাণপণে একটা হেঁচকা টান দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে তাকে একটা লাথি মেরে ফেলে দিতে চাইলাম। পারলাম না। কি ভীষণ শক্ত হাতে সে আমার পা জড়িয়ে ধরে আছে। আমার মনে হলো, আমার মৃত্যু অবধারিত। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমাকে ক্রমশ নীচে টানছে সে, তার শরীরের ভারটা একটা ভারী পাথরের মতো, আমাকে ডুবিয়ে মারতে চায়।

একটু আগে, এক মুহূর্ত আগে যাকে আত্মীয় বলে মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, যার জীবনকে আমার জীবনের চেয়ে এতটুকু কম মূল্যবান মনে হয় নি, তাকে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু মনে হলো, মনে হলো একটা নৃশংস শয়তান।

আমি আরেকবার একটা হেঁচকা টান দিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতে কি যেন ঠেকলো। হ্যাঁ, নৌকোর মোটা দড়িটা আমার হাতে ঠেকলো। আমি প্রাণপণ শক্তিতে সেটা ধরে রইলাম।

তারপর কি হলো, কি হয়েছিলো আমি নিজেও জানি না। আমাকে কে নৌকোয় টেনে তুলেছিলো, আর ছেলেটা—বাবুয়া—কি ভাবে আমার পা থেকে হাঁটু—হাঁটু থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠেছিলো, জীবন ফিরে পেয়েছিলো, সে সব পরের মুখেই শুনেছিলাম।

শুনেছিলাম, মাঝিরা আমাকে আর বাবুয়াকে ঘাটে নিয়ে আসার অনেকক্ষণ পরে।

এক হাত ঘোমটার সেই বউটি তখন বাবুয়াকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে হাউমাউ করে। আর আমাকে ঘিরে আছে শিউপ্রসাদ, বিশ্বনাথন, গুরুমুখ সিং।

আর, আর আমি উঠে বসতেই গলায় কুঁচের মালা, কানে সোনার মাকড়ি পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আনন্দে হেসে উঠলেন, আমার হাত দুটো তাঁর হাতের, মধ্যে নিয়ে কি যেন বলতে গেলেন তিনি, পারলেন না। শুধু তাঁর দু চোখ ছাপিয়ে জল নামলো।

আমি তখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটু পরে কথা ফুটলো ভদ্রলোকের মুখে। বললেন, তুমি আমার জীওন' দিয়েছো বেটা, আমার বেটার জীওন বাঁচিয়েছো।

কৃতজ্ঞতার যেন 'আর শেষ নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে কি যে বলবেন, কি যে করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না।

তারপর একসময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার নাম ঠিকানা জেনে নিলেন, আর বললেন, তুমি আমার বেটার জীওন বাঁচিয়েছো বাঙালীবাবু, তোমার জন্যে আমি সব করবো, যা চাইবে তুমি, যখন চাইবে।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি নিমাপুরের রাজা, বিনয়েন্দ্র-মোহন সিংহরাও আমার নাম। একটা লেফাফা দিয়ে খবর

নিলে আমি হাজির হয়ে যাবো···বাবুয়া আমার বেটা, তুমিও আমার বেটা!

তারপর বহুকাল পার হয়ে গেছে। পরপর তুবার পরীক্ষায় ফেল করে কবে থেকে যেন সমাজসেবী হয়ে উঠেছিলাম। সমাজের সেবা করবো, সমাজের উপকার করবো—এমনি সব মহৎ আদর্শের পিছনে উৎসর্গ করলাম নিজেকে। কেন কে জানে। হয়তো বন্ধুদের অনেকেই এ-পথে সাড়া দিয়েছিলো বলে, কিংবা···হ্যাঁ, আমার মনের গোপনে কোথাও একটা আত্মধিক্কার জমে ছিলো। হ্যাঁ, বিনয়েন্দ্র সিংহরাওয়ের সেদিনকার সেই সজল চোখ আর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বোধ হয় বারবার মনে পড়িয়ে দিতো, আমি কত স্বার্থপর, কত মিথ্যা গৌরবের অধিকারী।

কিন্তু বিনয়েন্দ্রমোহনকে ভুলতে পারলাম না। তখন আমরা নেচে উঠেছি—একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরছি দিকে দিকে। হঠাৎ একদিন মনে হলো, নিমা-পুরের সেই রাজাকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়। দেবেন না হয়তো কিছুই, এতদিনে কি আর মনে আছে, তবু দেখা যাক, যদি দেন তু-একশো।

নিমাপুর জায়গাটা কোথায় খুঁজে বের করে চিঠি দিলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে লিখলাম, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনদিন প্রয়োজন হলে সাহায্য করবেন, তাই লিখছি।

আমি কল্পনাও করি নি। হাসপাতাল কমিটির নামে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক এলো, এবং একখানা চিঠি: আরও কত লাগবে জানাবেন।

হাসপাতাল থেকে ইস্কুল, ইস্কুল থেকে কলেজ—যখন যে খাতেই টাকার দরকার হয়েছে চিঠি লিখেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাঠিয়ে

দিয়েছেন বিনয়েন্দ্রমোহন। আর তা দেখে আমার লোভ বেড়ে গেছে—কিংবা অহংকার। শুধু নিজের কাজেই নয়, যখুন যেখানে কেউ টাকার অভাবে পড়েছে, কিংবা চাঁদা চেয়েছে, বিনয়েন্দ্রমোহনের নামে চিঠি দিয়ে দিয়েছি—তাঁকে যেন সাহায্য করা হয়। আর কি আশ্চর্য, কেউ বিফল হয় নি। তবে প্রথম প্রথম দরাজ হাতে দান করেছেন তিনি, শেষের দিকে যেন তেমন মুক্তহস্ত ছিলেন না। কিন্তু কিছু না কিছু সাহায্য করেছেন।

আমার নিজেরও কেমন একটা অধিকার দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। যেন বিনয়েন্দ্রমোহনকে দেশের সেবায় টাকা খরচ করতে দিয়ে আমি তাঁকে কৃতার্থই করছি।

কোন হিন্দী কবি তাঁর কবিতার বই বের করতে পারছেন না, লিখে দাও বিনয়েন্দ্রমোহনকে। কোন রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে তাঁর পরিবারবর্গ দুঃস্থ হয়ে পড়েছে, বিনয়েন্দ্রমোহন থাকতে দুশ্চিন্তা কিসের! ভাবতাম, তাঁর ছেলের জীবন বাঁচিয়েছি, টাকায় কি তা শোধ হয়!

তাই প্রথমটা আশ্চর্য হয়েছিলাম। কাশীর এক বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ের ক্যান্সার হলো, চিকিৎসার জন্যে টাকা দরকার। চিঠি দিলাম বিনয়েন্দ্রমোহনকে। কিন্তু চিঠির উত্তরটুকুও এলো না। টাকা তো দূরের কথা। ভাবলাম, চিঠি পান নি, তাই আবার চিঠি দিলাম। কিন্তু এবারও উত্তর এলো না।

মনে মনে রেগে গেলাম। সকলেই ভেবেছিলো আমি চিঠি দিলেই টাকা আসবে। তাদের কাছে আমার সম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন অকৃতজ্ঞ লোকটা? হ্যাঁ, অকৃতজ্ঞই মনে হলো বিনয়েন্দ্রমোহনকে। তাঁর ছেলের জীবন বাঁচিয়েছিলাম একদিন, টাকা দিয়েই কি তা শোধ হয়ে গেছে ভেবেছেন নিমাপুরের রাজা? মাত্র বাইশখানা গ্রাম নিয়ে তো রাজত্ব—

শুনেছিলাম অনেক আগেই—তাই নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টাও করলাম।

কিন্তু রাগ গেলো না মন থেকে। বেশ চটে গিয়েছিলাম বলেই আর কোন চিঠি দিই নি।

কয়েক মাস পরের কথা। ইলেকশনের কাজে মজঃফরপুর যাচ্ছি, মাঝপথের একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন থামতেই চমকে উঠলাম! এই তো সেই নিমাপুর!

নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে।

রাজার নাম বলতে কুলিটা কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে, তারপর আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলো রাস্তাটা।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে এসে পৌছলাম যে বাড়িটায়, সেটাকে কোনক্রমেই রাজবাড়ি বলা চলে না। মান্ধাতা আমলের জীর্ণ পড়ো বাড়ি, আধখানা ধসে গেছে, খান দুই ঘর তখনও টিঁকে আছে কোন প্রকারে।

ডাকাডাকির পর এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। হাড় বের করা শীর্ণ চেহারা, মাথার সব চুল সাদা, সারা গায়ে শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। ঠুকঠুক করে এসে বললেন, রাজা নয় বাবু, আমি ফকির বিনয়েন্দ্রমোহন।

আমি আমার নাম বললাম।

ছানি-পড়া চোখে ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না বুড়ো। কিন্তু পুরনো দিনের পরিচয় দিতেই লাঠিটা ফেলে দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে, হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, বেটা, আমার বেটা!

বললাম, কোথায় আপনার বেটা? বাবুয়া কই? কত বড় হয়েছে সে?

উত্তর নেই। ছানিপড়া সজল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুড়ো। বললেন, বাবুয়া? আপনি তার জীওন বাঁচালে কি হবে বাবুজী, বানারস থেকে আসার তু মাস বাদেই তো ভগবান তাকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাবুয়া মারা গেছে! কাশী থেকে ফিরেই মারা গিয়েছিলো? কি আশ্চর্য, না জেনে বুড়োর ওপর কত অত্যাচার না করেছি বারে বারে টাকা চেয়ে। প্রতিবারেই তাঁকে মনে পড়িয়ে দিয়েছি বাবুয়ার কথা। আর, আর বাবুয়া মারা গেছে, তবু তার জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতার ঋণ সারাজীবন ধরে শোধ করে গেছেন নিমাপুরের রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাও—যাঁর মৃত্যু-সংবাদ বেরিয়েছে আজকের খবরের কাগজে। তাও মাত্র পাঁচ লাইনে। আজ তাই তাঁকে নিয়েই এ গল্প লিখলাম। কিন্তু এত সহজেই তাঁর ঋণ শোধ করা যাবে?

[১৩৬৮]

তিনটি প্রশ্ন

তখন সবে দাঙ্গা থেমে গেছে। মানুষ চলাচল শুরু হয়েছে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। তবু মনের ক্লেদ সম্পূর্ণ মুছে যায় নি, ভিতরে ভিতরে সকলেই সতর্ক। এদিকে কাজ কর্ম শুরু হয়েছে, দোকান-পাট খুলেছে, তাই ব্যস্ততার মধ্যে সতর্ক ভাবটা মুছে যায়।

এমনি একটা দিনের কথা মনে পড়ছে।

বিকেল চারটা, কিংবা চারটেও বাজে নি হয়তো তখন। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে আর প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে সাজানো পুরনো বইয়ের প্রলোভনের যে নেশা ধরেছিলো ছাত্রজীবন থেকে, দীর্ঘদিনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে সব প্রথমে তারই হাতছানি মনে পড়লো।

একা-একাই একটা দোতলা বাসে উঠে বসলাম। গিয়ে নামলাম কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। আর বাস থেকে নেমে মনে হলো, না, শহরটা এখনও সহজ আর প্রকৃতিস্থ হয় নি। স্বাভাবিকতা ফেরে নি তখনও। কারণ রেলিংগুলো তখনও শূন্য, ফুটপাথ নিরাভরণ। শুধু ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় বইয়ের দোকানগুলির বড় বড় দরজার সারি আধখোলা। দোকানে দোকানে কর্মচারীরা বসে আছে, খদ্দের নেই।

দু-মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম, কি করা যায়। এতখানি পথ এসে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতেও ইচ্ছে হলো না।

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের এক প্রকাশক বন্ধুর কথা মনে পড়লো। মাঝে মাঝে দু-চারজন সাহিত্যিক সেখানে এসে জমায়েত হন, অপ্রশস্ত ঘরখানিতে প্রশস্ত আড্ডা জমে। সুতরাং সেখানেই একদফা ঢুঁ মেরে যাই।

গিয়ে দেখি স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের গন্ধ আর গ্যামাক্সিনের গন্ধমাখা ঘরটিতে বন্ধুটি চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

খদ্দের না হোক পাওনাদার ঢুকলেও যেন বন্ধুটি খুশী হয়ে উঠতেন। সব দোকাদারেরই তখন অবস্থা একই ধারা। তাই আমাকে পেয়ে যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

বললাম, একা একা যে!

বন্ধুটি হাসলেন। বললেন, আরও দাঙ্গা করুন।

তাঁর কথা বলার ধরনই এই। যেন পৃথিবীর যাবতীয় অসৎকর্ম তাঁর বন্ধুরা করছেন এবং তিনিই শুধু সৎপথে রয়েছেন। তবে তাঁর কথা বলার এই বিচিত্র ধরনটির সঙ্গে পরিচিত বলেই আমি আপত্তি তুললাম না। আর তা দেখে বন্ধুটি দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার শুরু করলেন।

তারপর একসময় তিনি থামলেন।

প্রশ্ন করলাম, পুরনো বইয়ের দোকানগুলো কি খুলবে না?

—কি করে খুলবে শুনি? বন্ধুটি আবার উষ্মা প্রকাশ করলেন। সমবেদনা জানিয়ে বললেন, গরীব বেচারীরা দুটো পয়সা 'করে' খায়, তাও সাহস করে এসে দোকান খুলতে পারছে না।

অনেকক্ষণ ধরেই এই একই ধরনের আলোচনা চললো, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনেই স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, দাঙ্গা কারও কোন উপকারে আসে না।

অবশ্য এই আলোচনার পরই আমরা বেরিয়ে আসি নি। যথানিয়মে আলোচনা রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি কক্ষপথে বিচরণ করে সিনেমায় এসে থেমেছিলো। এবং তারপর আমরা আবিষ্কার করেছিলাম এক কাপ চা খাওয়া প্রয়োজন।

তাই দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছিলাম হ্যারিসন রোডের মোড়ে। হয়তো মনে মনে ভাবছিলাম, কোন্ রেস্তোরাঁয় ঢোকা যায়।

রাস্তায় রোদ্দুরের তাপ তখন অনেকটা স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। ফুটপাথে ভিড় বেড়েছে। দু-একটা গাড়ি হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে।

রাস্তা পার হতে যাবো, হঠাৎ দেখি একখানা জীপ আসছে বিদ্যুৎবেগে, বিদ্যুতের মতোই তা আমাদের পার হয়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়েলী কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো চলন্ত জীপ থেকে।

একটি মুহূর্তের ঘটনা, কিন্তু আজ তার বর্ণনা দিতে গেলে একটা উপন্যাসের পরিধিতেও কুলোবে না।

তীব্র করুণ কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো।—বাঁচান, আমাকে বাঁচান!

না, কথাটা স্পষ্ট শুনতে পাই নি, বুঝতে পারি নি। কিন্তু বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে যাওয়া একটি জীপ-গাড়ির ভিতর নারীকণ্ঠের আর্তনাদ এ-ছাড়া আর কি কথা বলতে পারে। শুধু মনে আছে তার চিৎকারের শেষ দিকটা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। যেন কেউ তার মুখ চেপে ধরলো।

স্তম্ভিত বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই চলন্ত জীপটার দিকে নির্বিকার তাকিয়ে রইলো দু-পাশের জনতা। আমরাও বিভ্রান্ত অকিঞ্চন দাঁড়িয়ে রইলাম।

যেমন বিদ্যুৎবেগে জীপখানা পশ্চিম দিক থেকে এলো তেমনি বেগেই চলে গেলো শেয়ালদার দিকে। আর মনে হলো একটি ট্যাক্সি যেন তাকে ধাওয়া করেছে।

পাঁচটি মিনিটে রাস্তার দু-পাশের লোক যে যেখানে ছিলো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো অবাক বিস্ময়ে। মনের মধ্যে একটা উত্তাল রহস্যের ঢেউ ফেটে পড়লো, একটা বেদনার তরঙ্গ।

তারপর দু-পাশের ভিড় আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। যে যার

কাজে চলে গেলো। আমরাও। কিন্তু মন থেকে সেই একটি কান্না-ভরা চিৎকার মুছে গেলো না। সেই রহস্য আজও মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। থেকে থেকে সেদিনের সেই চিৎকার যেন কানে ভেসে আসে। একটি অসহায় কণ্ঠের আবেদন—বাঁচান, আমাকে বাঁচান!

নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কতদিন সেই রহস্যের সমাধান খুঁজেছি। সেই চলন্ত জীপের চারজন আরোহীর মুখ এখনও ভাসা ভাসা মনে পড়ে। কিন্তু, না, সেই মেয়েটির মুখ দেখতে পাই নি, শাড়ির প্রান্তটুকুও না।

আজও ভাবি পিছনের ট্যাক্সিচালক কি জীপখানাকে ধরতে পেরেছিলো? একটি অসহায় নারীর সম্মান রাখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলো কেউ? উদ্ধার পেয়েছিলো সেই মেয়েটি? কোনদিন, কোনদিন সে কি মুক্তির আলো দেখেছে?

না, এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর আজও খুঁজে পাই নি। শুধু মনে পড়ে সেদিন আমরা দু-বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারি নি। আমরা দুজনেই যে চা খেতে বেরিয়েছিলাম, সেকথাও ভুলে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর একসময় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো গিয়ে বসেছিলাম একটি চায়ের দোকানে। মুখোমুখি। কেউ কোন কথা বলি নি, দুজনের মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিলো। দু-কাপ চা আমাদের দুজনের সামনে, অথচ চুমুক দিতে ইচ্ছে নেই।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে বন্ধুটি বলেছিলো, দাঙ্গাটা থামিয়ে না দিলেই হতো! বলে একটা দির্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন সশব্দে!

২

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়েছে। চাকরি না পেয়ে ব্যবসার চেষ্টা করছি তখন। আর পাঁচরকম ব্যবসার পাঁচ দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে হঠাৎ আচমকা হাতে কিছু টাকা এসে গেছে। তাই মনে মনে এবং কখনও কখনও খাতায় কলমে মতলব ভাঁজছি কি করে টাকাটা আরও লাভের ব্যবসায় খাটানো যায়।

এমন সময় ইস্কুলের সহপাঠী নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। নিরঞ্জন তখন ডাক্তারি পড়ছে, সেই বছরই তার ফাইনাল ইয়ার। বোধ হয় তার মাসকয়েক পরেই।

সব শুনে নিরঞ্জন বললো, ক-টা মাস অপেক্ষা কর্। ডাক্তার হয়ে বের হই, তারপর একটা ওষুধের দোকান খুলবো দুজনে, খুব লাভের ব্যবসা, বুঝলি?

প্ল্যানটা বেশ মনঃপুত হলো। বললাম, তাই হবে। তবে প্রথমটা একটু ছোট করে করবো, তারপর……

তারপর কি কি করবো, দিনে দিনে ব্যবসা কি ভাবে জেঁকে উঠবে, নিজেরাই কোনও চুলের তেল বের করবো কিনা, এমনি সব সাতপাঁচ জল্পনা-কল্পনা করতে করতে কখন যে এতটা রাত হয়ে গেছে, কেউই টের পাই নি।

বহুদিন পরে ছেলেবেলার একজন বন্ধুকে পেয়ে মানুষ এমনিতেই মশগুল হয়ে ওঠে, বেকারের কাছে ব্যবসার আলোচনা তো সময় ভুলিয়ে দেবেই।

রেস্তোরাঁ থেকে বের হবার সময়ে বুঝতে পারলাম কত রাত হয়েছে। প্রথমে চায়ের দাম দিতে গিয়ে, দ্বিতীয়বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

রাত তখন দশটা কি সাড়ে দশটা, পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। এতকাল পরে স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু সময়টা বোধ হয় শীতকাল। তা না হলে পর পর বারো কাপ চা দুজনে মিলে খেতাম না, আর রাত সাড়ে দশটায় পথঘাট এত নির্জনও হতো না।

দুজনেই বেরিয়ে এলাম রেস্তোরাঁ থেকে। একটা দোতলা বাস দেখতে পেয়েই উঠে পড়লাম দুজনে।

নিরঞ্জন আর আমি, দুজনেই দক্ষিণের যাত্রী। উঠে বসেছি সামনের দিকের সীটে। চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে বাসটা, লাল নীল আলোর রোমাঞ্চ পার হয়ে। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে গড়ের মাঠে, দোকানের আলো নেবানো আবছা ফুটপাথে দুচারটে ফিরিঙ্গি মেয়েপুরুষ, দুএকটা ক্লান্ত ফিটন।

বাসটা ছুটে চলেছে, ভবানীপুরের দিকে। দুপাশের দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার, নিঃশব্দ, নির্জন।

এলগিন রোডের মোড়ে এসে বাসটা ক্ষণিকের জন্য থামলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ভেসে এলো। একটি নারীকণ্ঠের সেই নির্জন নিঃশব্দতার মধ্যে একটা তীব্র আর্তনাদ।

বাসযাত্রীদের গুঞ্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কান পেতে আরেকবার সেই চিৎকারটা শোনবার জন্যে সকলেই যেন উন্মুখ হয়ে উঠলো।

কিন্তু না, আর কোন চিৎকার শোনা গেলো না। সকলেই আমরা বিস্মিত চোখে এদিক ওদিক তাকালাম। স্পষ্ট একটি নারী কণ্ঠের আর্তনাদ শুনেছি এইমাত্র, অথচ এই অন্ধকার বাড়িগুলোর মাঝে কোথায় কোন্ ফ্লাটে সেই রহস্য চাপা পড়ে গেলো আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। কেবল বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা।

আর ঠিক সেই সময়ে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো।

বললাম, কোথায় চললি ?

ও উন্মত্ত আবেগে বলে উঠলো, যাবো না ? দেখবো না ? কোথায় কি হয়েছে দেখতে হবে না, বাঁচাতে হবে না মেয়েটিকে ? আহা বেচারী !

বলেই তরতর করে নেমে গেলো নিরঞ্জন। বাসসুদ্ধ সকলেই যেন খুশী হলো। আর আমিও বোধ হয় বাধ্য হয়েই নিরঞ্জনের পিছনে পিছনে নেমে পড়লাম।

আরও মুহূর্ত-কয়েক অপেক্ষা করে বাসটা চলে গেলো। আমি আর নিরঞ্জন বৃথাই অন্ধকার বাড়িগুলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু না, আর কোন চিৎকার শুনতে পেলাম না। যেন ও-চিৎকারে পড়শীদের কেউই বিচলিত হয় নি ।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু মন থেকে সে রহস্য মুছে যায় নি কোনদিন।

কিন্তু তার চেয়েও বড় রহস্য মনে হয়েছিলো নিরঞ্জনকে।

ডাক্তারি পাশ করার পরই বিয়ে করলো নিরঞ্জন, আমরা কয়েকজন বন্ধু বরযাত্রী গিয়েছিলাম।

তারপরও কয়েকবার দেখা হয়েছে, গল্পগুজব হয়েছে। কিন্তু ওষুধের দোকান খোলার জল্পনা-কল্পনায় আগের মতো আর মেতে ওঠে নি ও। নিরঞ্জন তখন বিলেত যাবার তোড়জোড় করছে। শ্বশুর ওকে বিলেত পাঠাবে, গর্ব করে বলেছে সে।

এমনিতেই তো বন্ধুরা বিয়ের পর দূরে সরে যায়, নিরঞ্জন আবার বিলেত যাবার কথা শোনায় দেখা হলেই, তাই কি করে আপনা থেকেই যেন দূরে সরে গেল ও।

কবে থেকে যে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো জানি না। বছর তিনেক পরে হঠাৎ আরেক বন্ধু এসে খবর দিলো, নিরঞ্জনের বিয়ে।

—বিয়ে? আমি চমকে উঠলাম। ওর স্ত্রী যে মারা গেছে, শুনি নি তো।

বন্ধুটি হাসলো—মারা যাবে কেন?

—তবে?

উত্তর এলো, শ্বশুর ব্যবসায়ে ফেল মেরে নিরঞ্জনকে বিলেত পাঠাতে পারলো না যে, তাই আবার বিয়ে করছে নিরঞ্জন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম, ওর বউ?

বন্ধুটি হাসলো আবার।—তাকে তো বিয়ের ক-মাস পরেই বাপের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

সত্যি বলতে কি, খবরটা শুনেও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু সত্যিই একদিন একটা ছাপা নিমন্ত্রণপত্র পেলাম।

আর সেদিন বার বার মনে পড়লো সেই রাত্রির কথা। একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে যেদিন নিরঞ্জন আর্তনাদ করে উঠেছিলো, বাঁচাতে হবে না মেয়েটিকে? আহা, বেচারী!

বারবার ওই একটা কথাই আমার মনে বেজেছিলো, আর সেই মেয়েলী চিৎকার।

৩

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ে। মেদিনীপুরের সেই দিনগুলির একটি।

ওদিকে সুবিস্তৃত ধোবীঘাট, সারি বেঁধে ধোপার দল সকাল সন্ধ্যা কেবল কাপড় আছড়াচ্ছে চৌবাচ্চার ধারের শানের ওপর। আর এদিকে মাত্র পাঁচ-সাতখানা বাড়ি। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর তাঁর বাঙালী স্ত্রী—প্রায়-বাঙালী ছেলেমেয়ে। দুটি মধ্যবিত্ত পরিবার পাশাপাশি, তার ও-পাশে একটি বাঙালী পরিবার।

আত্মহত্যা ?

না। হৃদয় ঘোষের বড় মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিলো। পাশের বাড়ি গিয়েছিলাম, ছুটে এসে দেখি সব শেষ।

হৃদয় ঘোষ বাড়ি ছিলো না, কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরলো। তারপর খবর শুনেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

আমাদের চোখেও জল এলো সে দৃশ্য দেখে।

তারপর এক সময় হৃদয় ঘোষ বেরিয়ে এলো, ঝিম মেরে বসে রইলো একধারে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন নিজেই বললে, মায়ের আমার আবার বিয়ে দেব ভেবেছিলাম।

আমরা চলে এলাম একে একে। ফেরার পথে একজন বললে দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে আগুন লেগে গেছে ? বিশ্বাস হয় ?

আরেকজন বললে, আত্মহত্যা করলে দরজা খুলে রাখবে কেন ?

সে-প্রশ্নেরও উত্তর দিলো একজন। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন জাগলো, হৃদয় ঘোষ তো আবার বিয়ে দিতেও রাজি ছিলো তার। তবে ? আত্মহত্যা করবে কেন সে ?

কিন্তু, কি আশ্চর্য, আমরা কেউই প্রশ্ন করলাম না, চিৎকার শুনেও আমরা একজনও কেন ছুটে যাই নি।

[১৩৬৭]

স্ত্রৈণ (Uxorious)

মেসের সবাই ওকে ঠাট্টা করে। করে আসছে স্ত্রৈণ বলে। ভৈরব শোনে আর হাসে। হাসিটা যেন অভিযোগের পিঠে সায় দিতে চায়। আসলে ভৈরব নিজেও নিজেকে তাই ভাবে, ভেবে খুশী হয়।

অথচ মেসের পুরনো বাসিন্দেরাও তো কই কোনদিন ভৈরবের স্ত্রীকে দেখে নি। তার ছেলেমেয়ে ছোট সংসার—এ সবের কিছুই দেখে নি তারা। কদাচিৎ দু-একজনের চোখে হয়তো সেই নতুন বিয়ের পর বউয়ের লেখা খামখানা পড়েছে, কিন্তু তার ওপরও ঠিকানাটা লেখা থাকতো আপিসের টাইপরাইটারে টাইপ করা। পাছে মেয়েলী হাতের ঠিকানা দেখে কেউ সন্দেহ করে, খুলে পড়ে, তাই খামের পিঠে ঠিকানা টাইপ করে নতুন বউকে দিয়ে আসতো ভৈরব। সে খাম যে কবে থেকে পোস্টকার্ড হয়ে গেছে, পোস্টকার্ডে ঠিকানা লেখা রয়েছে আঁকাবাঁকা অক্ষরে, সে অক্ষরের লেখা চিঠি হাতে পেয়েও কবে থেকে যে বাসিন্দে-বন্ধুদের পড়ে দেখার কৌতূহল মরে গেছে, তা ভৈরব নিজেও জানে না।

মরে নি শুধু একটা নেশা। শনিবারের নেশা।

এ নেশা শুধু ভৈরবের নয়। নিশীথ কুণ্ডু লেনের মেসবাড়ির ছাদের ফুটো হয়ে যাওয়া গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে চুঁইয়ে পড়া জলে ভিজে ভিজে যে ইঁটগুলো নড়বড়ে দাঁতের মত হয়ে উঠেছে, যেন একটু আঘাত লাগলেই খসে পড়বে, সেই ইঁটগুলোও অন্যরকম দেখায় শনিবার এলেই। অন্তত বাসিন্দেদের চোখে। তা না হলে অন্য দিন আপিসে যাবার মুখে জামাকাপড়ে দু-এক ছিটে জল এসে

পড়লেই যারা বাড়িওলার উদ্দেশ্যে অস্ফুট কোন অশিষ্ট উক্তি করে বসে, তারাও কেন শনিবার হলেই মেসবাড়ির নোংরা আবহাওয়ার মধ্যেও এতখানি আরাম খুঁজে পাবে!

ভৈরবের সঙ্গে একই ঘরে আরেকখানা তক্তপোশ নিয়ে থাকে সরল মুন্সী। বিয়ে-থা করে নি, সেই কোন পাঠ্যজীবনে কলকাতায় এক মেসে এসে উঠেছিলো, তারপর ডজনখানেক মেস বদলে—এখানে। এই নিশীথ কুণ্ডু লেনে। নিশীথ কুণ্ডু লেনেই বুঝি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। শনিবার হলেই এক কাপ চায়ের সঙ্গে রেসের বইটা খুলে বসে সরল মুন্সী। মাঠে রেস না থাকলে ঘরেই তে-তাসের আড্ডা জমাবার জন্যে একে-ওকে বলে রাখে।—মুকুন্দবাবু তাড়াতাড়ি ফিরবেন মশাই, একহাত বসা যাবে।

মুকুন্দবাবু কখনো রাজী হন, কখনো বা গিলে-করা পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়ে, তাঁতের ধুতিতে চুনোট দিতে দিতে বলেন, না সরল-বাবু, আজ একটু কাজ আছে।

সারা সপ্তাহটা যিনি আধময়লা জামাকাপড়ে কাটিয়ে দেন, ধোপ-দুরস্ত বাবু সেজে তিনি যে কোন্ কর্তব্যের ডাকে বেরিয়ে যান জানতে কারো বাকী নেই। তাই উত্তর শুনে সরল মুন্সী শুধু হাসে।

কিন্তু এই মুকুন্দবাবুও সরল মুন্সীর মতই ঠাট্টা করেন ভৈরবকে। বলেন, আপনার মতো স্ত্রৈণ লোক মশাই জীবনে দেখি নি।

আর তাদের দেখাদেখি কলেজের ছোকরা অনুপমও শনিবার হলেই বলে, কি ভৈরবদা, বউদির মুখখানা একবার দেখে আসবার জন্যে বাড়ি যাচ্ছেন নাকি?

ভৈরব শোনে আর হাসে। আসলে শনিবার সকাল থেকেই কি আর তৈরী হয় সে! তৈরী হয় সারা সপ্তাহ ধরেই। সোমবার সকালে যখন ছুটতে ছুটতে এসে সাতটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরে

মেমারীতে, ট্রেনে উঠে একটা বসার জায়গা খুঁজে পায়, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ভৈরব।

স্বপ্নই তো। মাঝে মাঝে শুধু স্ত্রীর ছু-চারটে ফাইফরমাশ মনে পড়ে যায়। বড় ছেলেটার জন্যে একখানা পাটীগণিত কিনতে হবে, ছোট মেয়ের জন্যে ওষুধ, স্ত্রীর শাড়িখানার আড়ং ধোলাই ইত্যাদি মনে উঁকি দেয়, স্বপ্ন ভেঙে দেয। তারপর প্রতিদিনই এটা-ওটা কিনে, যোগাড় কবে করে মেসে ফেবে আপিস ছুটির পর। আর শনিবাব সকালে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে একটা থলের মধ্যে ভরে নেয় ভৈরব। গুণেব অঙ্ক কষাব সময় মনে মনে নামতা আউড়ে নেবাব মত কোথাও কিছু ভুলভ্রান্তি বাদ ছাঁদ পড়লো কিনা ভাবতে চেষ্টা কবে। তারপব তাড়াহুড়ো স্নান সেরে থলি-ব্যাগটা হাতে নিয়েই খাবার ঘরে নেমে যায় ও।

তারপর আপিস, আপিস ছুটির পর পড়ি-কি-মরি করে ভিড়ে-ভবা বাসেব পা-দানিতে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে কাঁধে থলি-ব্যাগ ঝুলিয়ে নিজেকেও ঝুলতে ঝুলতে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছতে হয়।

ট্রাম-বাসের মতোই লোকাল ট্রেনেও সমান ভিড়। তারই মধ্যে কোন রকমে উঠে পড়ে তবে নিশ্চিন্তি। ছুটো তিরিশের ট্রেনটা না পেলে বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। মনে হয় একটা বেলা বরবাদ হয়ে গেলো। শুধু কি তাই ? ভৈরব নিজেও জানে না, ছুটো তিরিশের ট্রেনটা না পেলে হঠাৎ তার মন-মেজাজ এতো খারাপ হয়ে যায় কেন।

কিন্তু না ট্রেনটা হাতছাড়া হয় না বড় একটা। ঠিক হিসাব করেই বের হয় ভৈরব। হিসেব মতই ট্রেনে জায়গাও পেয়ে যায়। কখনো চেনাজানা ছু-একজন ডেকে জায়গা দেয়, মুখচেনা অনেকে সরে বসে আধখানা আসন ছেড়ে।

তারপর ইলেকট্রিক ট্রেনের চেয়েও তাড়াতাড়ি ছুটতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে, আর কতক্ষণ বাকী। কখনো বা মাইল পোস্ট দেখে। মাইল পোস্ট অবশ্য এখন আর দেখতে হয় না, এ ক-বছরে এ লাইনের সব নাড়ীনক্ষত্র তার চেনা হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়েই বুঝতে পারে কোথায় এসেছি, কতদূর। দু-পাশের গাছগুলো, জলে ডোবা খালবিল, এমন কি মাঠে মাঠে পানের ববজ কিংবা ধানের ফলন দেখেও চিনতে পারে।

আশপাশেব লোক অবশ্য ভৈববের মতো অধৈর্য হয়ে ওঠে না। ট্রেনে যখন উঠেছি, ঠিক সময়েই পৌঁছবো। বড়জোর দু-দশ মিনিট লেট হবে। কি যায় আসে তাতে। ট্রেনে উঠেই ওদিকে চার বন্ধু সামনা-সামনি বসে হাঁটুতে হাটুতে একটা টেবিল বানিয়ে নিয়েছে। তার ওপব রুমাল পেতে তাস ভাঁজতে শুরু করেছে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। জানালার পাশে বসে একটি ছোকরা উপন্যাসের পাতায় ডুবে গেছে। সার্ভিস ম্যানুয়েলের কোন্ সাব-ক্লজ দেখিয়ে ছোটসাহেবকে কে জব্দ কবেছে তার উল্লসিত বর্ণনা চলে কোথাও। কিন্তু ভৈরবের সেদিকে চোখ নেই, কান নেই।

মেমারী স্টেশনে এসে ট্রেন থামলে তবে শান্তি। ততক্ষণে ট্রেনের কামরাও ফাঁকা হয়ে গেছে একে একে।. তাড়াহুড়ো করেই নেমে পড়ে ভৈরব। এক হাতে ব্যাগ আর অন্যহাতে কপি, নয়তো ইলিশ মাছটা ঝুলিয়ে নিয়ে প্লাটফর্ম হতে বেরিয়ে পড়ে।

এরপরও দেড় মাইল পথ হেঁটে গিয়ে তবে গ্রামের বাড়ি। সেখানে ভৈরবের বউ, ছেলেমেয়ে, বেগুনের চারায় ছোট ছোট বেগুনী রঙের ফুল দেখা দিয়েছে। একটু একটু করে মাথা তুলছে গত বছরে বসানো নারকেলের চারা।

কিন্তু এ-সব কথা এখন মনে পড়ে না ভৈরবের।

বাস রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা গিয়ে তবে গ্রামের পথে বাঁক নিতে হয়। গোটা-কয়েক পয়সা দিলেই বাসে যাওয়া যায়। তবু এটুকু পথ হেঁটে চলাতেই ভৈরবের আনন্দ। না কি কয়েকটা পয়সা বাঁচিয়েই ?

পাশাপাশি কয়েকটা চালাঘর পাকা রাস্তার ধারে। কেউ চা সিঙাড়া খায়, টুকিটাকি জিনিস কেনে, কেউ বা বিড়ি খেতে খেতে বাসের জন্য অপেক্ষা করে। তাদের এড়িয়ে হনহন করে হেঁটে চলে ভৈরব। তারপর এক সময় পা গতি হারায়। নিজেরই অজান্তে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে ও, টিনের চালাগুলোর শেষে দোতলা ভাঙা পুরনো বাড়িখানা চোখে পড়তেই।

মান্ধাতা আমলের পুরনো বাড়ি। এক পাশের দেয়াল ভেঙে পড়ে ইঁটের স্তূপ জমেছে। ও-পাশের দেয়ালে শ্যাওলা, জানালা দরজা ক্ষয়ে গেছে বৃষ্টির জলে, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে রোদে পুড়ে।

বাড়িটার সামনে ঘাস আর কচুর শাক গজিয়ে জঙ্গল হয়ে আছে। তার ও-পাশে একটা ছোট্ট ডোবা।

একটু আগেই তো ইলেট্রিক ট্রেনটা বিচিত্র বাঁশি বাজিয়ে চলে গেছে। এই সংকেত শুনেই হয়তো বুঝতে পারে ভাঙা পুরনো বাড়ির চেনা-অচেনা একটি মেয়ে। এসে দাঁড়ায় দোতলার ভাঙা জানালার সামনে। চেয়ে দেখে যাত্রীদের।

ভৈরব হাতে থলি আর কপি ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। তারপর চোখ তুলে তাকায়।

চোখোচোখি হয় মেয়েটির সঙ্গে। আর অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরন খেলে যায় ভৈরবের শরীরে মনে। চোখের দৃষ্টি পরস্পরকে চিনে নেয়।

যতক্ষণ দেখা যায়, বাড়িটা পার হতে হতে বারবার চোখ ফিরিয়ে দেখে ভৈরব। একটি সুন্দর সপ্রতিভ মুখ অপেক্ষা করে থাকে

জানালার সামনে। সে মুখে বুঝি আনন্দের ঈষৎ হাসিটা জ্বলে উঠেই ধীরে ধীরে নিবে যায়। যৌবনে উজ্জ্বল সুন্দর সেই মুখখানি, টানাটানা দুটি চোখের ভাষা যেন ভৈরবের মনের ওপর কত অব্যক্ত হৃদয়ের কথা শুনিয়ে যায়। কবে থেকে সে মুখে বয়সের ঈষৎ ছাপ পড়েছে, কপালের সিঁদুরের ফোঁটাটা অদৃশ্য হয়েছে ভৈরব নিজেও বুঝি লক্ষ করে না।

মেয়েটিকে প্রথম যেই দেখতে পায়, চোখে চোখ পড়ে, ঈষৎ হাসি দোলে তার ঠোঁটে, অমনি অদ্ভুত একটা শিহরন খেলে যায় ভৈরবের সারা শরীরে। সব ক্লান্তি ঝরে পড়ে, প্রতীক্ষা সফল হয়।

এমন সময় বাড়িটা পার হয়ে চলে যায় ভৈরব, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই পার হয়ে যেতে হয়। মেয়েটিকেও আর দেখা যায় না। কিন্তু ভৈরবের মনের ওপর একটা মুগ্ধতার প্রলেপ থেকেই যায়।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবে মেঠো পথে বাঁক নিতে হয় মনের মধ্যে কতো কি কল্পনার সৌধ গড়তে গড়তে কখন যে গ্রামে এসে পৌঁছয় ও, ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়, ভৈরব নিজেও টের পায় না।

চমক ভাঙে বড় ছেলেটা ছুটে এসে যখন আদুরে গলায় প্রশ্ন করে, আমার বই এনেছো?

ছোট মেয়েটা কাছে আসে না। পুতুল নিয়ে দাওয়ার এক কোণে খেলা করতে করতে একবার শুধু চোখ তুলে তাকায় বাপের দিকে। তারপর অপেক্ষা করে।

ভৈরব তার দিকে তাকিয়ে হাসে, অভিমান বুঝতে পারে। তাই চুলের রীবনটা থলি থেকে বের করে এগিয়ে এসে মেয়েকে কোলে তুলে নেয়।

ওদিক থেকে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।—আলনায় কাপড় আছে, দে তো মণ্টু।

মণ্টু কাপড়খানা এনে দেয়, ভৈরব সামনের পুকুরটায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়ে। ট্রেনের জামা কাপড় পরে ঘরে ঢোকা নিষেধ, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর মন জুগিয়ে চলতে হয়। কিংবা স্ত্রীর মন জুগিয়ে চলতে যেন ভালই লাগে। সমস্ত মন জুড়ে তখন খুশী-খুশী ভাব। সেই আনন্দটুকু যেন স্ত্রীব ওপরই উজার করে দিতে ইচ্ছে হয়।

সারাক্ষণ ছেলেমেয়েদেব নিয়ে গল্প করে ভৈরব, আর দেখে স্ত্রী ওপাশে রান্নাঘরে একটাব পব একটা কাজ করে চলেছে। একবার কাছে এসে তুটো কথা বলাব সময় নেই। শোনার ধৈর্য নেই। দূর থেকে এক-চোখ দেখেই সন্তুষ্ট, আগের মতো কাছে এসে দাঁড়াতেও অনিচ্ছা যেন।

মণ্টুকে সঙ্গে নিয়েই বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা শাকসবজির বাগানটা তদাবক কবতে বেরিয়ে আসে ভৈরব। বাঃ, পালং শাকগুলো বেশ হরহরে হয়ে উঠেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে বেগুন ধরতে শুরু করেছে গাছে। খুরপি নিয়ে বেগুনের চারার নীচে মাটি ঢিলে করে দিতে দিতে মণ্টুকে উপদেশ দেয় ভৈরব।—ভেলীগুলো মাঝে মাঝে খুঁড়ে দিবি, বুঝলি। মাটি পড়ে ভেলী বন্ধ হয়ে গেলে জল আসবে না।

একটার পর একটা গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন পরম পরিতৃপ্তি। গত বছরে বসানো নারকেল গাছের চারাটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে ও কিছুক্ষণ। বাঃ, বেশ ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে। গাছটা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক মণ্টুর মতই। মণ্টুই কি কম বড় হয়েছে। গত বছরেও ভৈরবের হাঁটুর কাছে পড়তো মণ্টু, এখন প্রায় কোমর ছুঁইছুঁই।

বাগানের কাজ শেষ করে গাড়ুর জলে হাত-পা ধুয়ে দাওয়ায় মাত্বর বিছিয়ে বসে ভৈরব। ধীরে ধীরে অন্ধকার যেন নেমে আসে।

মন্টু হারিকেনটা জ্বেলে বইখাতা নিয়ে এসে বসে বাপের কাছে। সারা সপ্তাহে এই তিন বেলা ছেলের পড়াশুনোর খবর নিতে পায় ভৈরব। তাই একটা মুহূর্তও অপব্যয় করতে ইচ্ছে হয় না।

এতক্ষণে ভৈরবের স্ত্রীর সময় হয়। কাঁসার থালায় দুখানা পরোটা আর বেশ খানিকটা গুড় এনে নামিয়ে দেয়। ছোট মেয়েটা জলের গ্লাসটা এনে রাখে।

পরম পরিতৃপ্তিতে পরোটা দুখানা খায় ভৈরব, আর মন্টুর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর থালা আর গ্লাসটা তুলে নিয়ে যেতে যেতে জিগ্যেস করে, ওষুধটা এনেছো?

—হ্যাঁ, ওই থলিতে আছে। বলেই নিজে উঠে গিয়ে ওষুধটা বের করে দেয়। তারপর ব্যাগ থেকে জড়ি-পাড় শাড়িখানা বের করে খুশীর হাসি হেসে তাকায় স্ত্রীর দিকে। বলে, আপিসের লোককে দিয়ে শান্তিপুর থেকে ধুইয়ে এনেছি এবার, দেখো কেমন চমৎকার ধুয়েছে। ঠিক যেন নতুন। স্ত্রী খুশী হয়, লাজুক লাজুক হাসে।

আর কোন কথা নয়। ভৈরব আবার ছেলেকে পড়াতে শুরু করে।

কোনদিন বা আবার সেই সুন্দর মুখের স্মৃতিটুকু মুছে যেতে চায় না। স্টেশন থেকে নেমে হেঁটে আসতে আসতে দেখা সেই পুরনো ভাঙা দালানের জানালায় আঁটা ছবির মতো মুখখানা।

প্রতি শনিবারই দেখে আসছে তাকে, আবার সেই সোমবার সকালে যাবার সময়। মন্টু হয় নি তখন, ভৈরব বিয়ে করে নি, তখন থেকেই দেখে আসছে। ঠিক অমনি এসে দাঁড়াতো সে তখনো। কতই বা বয়স ছিলো! ষোল বছরের একটি কিশোরী মেয়ে—মুখেচোখে চটুল হাসি।

নাম জানে না তার ভৈরব, জানতে ইচ্ছেও হয় নি। শুধু দূর থেকে ক্ষণিকের জন্যে গোপন মনের রোমাঞ্চ বুনে আসে।

তারপর একদিন বিয়ে করে ফিরলো ভৈরব। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে করে নতুন বউকে নিয়ে গ্রামে ফিরছিলো সেদিন। ভৈরবের গালে কপালে তখনো চন্দনের ফোঁটা, নতুন বউয়ের মাথায় লাল চেলীর ঘোমটা।

বর-বউ দেখতে দু-পাশের লোক ছুটে এলো। আর তারই ফাঁকে ভৈরব দেখলে সমবয়েসী একটি মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। ভৈরবের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ফিক করে হেসে ফেললে মেয়েটি। আর সেদিন থেকেই যেন একটা পরিচয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠলো।

তারপর দিনে দিনে বয়েস বেড়েছে ভৈরবের, বয়েস বেড়েছে মেয়েটির। দোতলা পুরনো দালান-বাড়িটা থেকে ক্ষয়ে যাওয়া ইঁটের রাশি খসে খসে পড়েছে! আর সেই বাড়ি ঘিরে হঠাৎ একদিন চাঞ্চল্য দেখতে পেয়েছে ভৈরব, আনন্দের উল্লাসের হাওয়ায় মেতে উঠতে দেখেছে বাড়িটাকে। স্টেশন থেকে নেমে এমনি এক শনিবারের বিকেলে বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন ছাৎ করে উঠেছে।

একটা অবোধ্য, ব্যথা অনুভব করেছে ভৈরব বুকের মধ্যে। পরপর কয়েকটা শনিবার দীর্ঘশ্বাসের দৃষ্টি ফেলে তাকিয়েছে সে জানালাটার দিকে। ফিরে গেছে ব্যর্থ মন নিয়ে।

পর পর অনেকগুলো সপ্তাহ কেটে গেছে। ভিতরে ভিতরে যেন মুষড়ে পড়ছিলো ভৈরব। কখনো কখনো বা কল্পনার চোখে একটি সুখের নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছে মেয়েটির জন্যে। কি নাম মেয়েটির? মনে মনে কত সুন্দর নাম আউড়ে গেছে ভৈরব। কেমন দেখতে তার স্বামীকে? কেমন মানুষ? হয়তো খুব ভালবাসে সে ওই মেয়েটিকে। স্ত্রীকে ভালবাসাই তো স্বাভাবিক। ভৈরব নিজেই কি তার স্ত্রীকে কম ভালবাসে?

ভৈরব ভেবেছিলো আর কোনদিন বুঝি দেখতে পাবে না মেয়েটিকে।

কিন্তু একদিন চমকে উঠেছে জানালার সামনে সেই চেনা মুখখানাকে ফিরে আসতে দেখে। সিঁথির সিঁদুরটুকু দূর থেকে চোখে পড়ে নি, চোখে পড়েছে শুধু কপালের ডগডগে বড়ো একটা সিঁদুরের ফোঁটা। আর ভৈরবের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঈষৎ হেসে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে মেয়েটি।

দিনের পর দিন কেটে গেছে। আর দিনের পর দিন বিস্মিত হয়েছে ভৈরব তার দিকে তাকিয়ে। প্রতিবারই মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা পুষে ট্রেন থেকে নেমেছে, প্রতিবারই মনে হয়েছে, এবার হয়তো যাওয়ার পথে তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ঠিক সময়টিতে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে হাসি মুখে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে খুশীতে ভরে উঠেছে ভৈরবের মন, আবার রহস্যের মতো মনে হয়েছে তাকে। একটা কাল্পনিক দুঃখে সমবেদনা জেগেছে। মনের মধ্যে শত প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেছে। মেয়েটি বছরের পর বছর এখানেই, এই বাড়িতেই কাটিয়ে চলেছে কেন! কেন, কেন! কোন উত্তর খুঁজে পায় নি ভৈরব।

তবু এ এক অদ্ভুত নেশা। ওদিকে না তাকিয়ে পারে না ভৈরব। কয়েকটি মুহূর্তের জন্য, তবু তারই মধ্যে যেন লুকোনো আছে কি এক অপার্থিব আনন্দ।

সোমবার ভোর হতে না হতেই আবার ওই স্বপ্নটা উঁকি দেয়। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরী হয়। মুখ হাত ধুয়ে এসে দেখে, স্ত্রী উনোন ধরিয়ে রান্না শুরু করে দিয়েছে। ট্রেন থেকে একেবারে সটান আপিস চলে যেতে হয় ভৈরবকে, তাই স্নান সেরে নাকেমুখে দুটি ভাত গুঁজে নিয়ে ছুটতে হয়। নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না, সময়মতো আপিসে পৌঁছতে পারবে না।

আপিসের ছুটির পর সেই নিশীথ কুণ্ডু লেনের মেসবাড়ি। ছাদের গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক থেকে জলের ছিটে পড়ে। জলে ভেজা শ্যাওলা পড়া দেয়ালে কি একটা বিদঘুটে গন্ধ। দশটা পাঁচটা আপিস।

রেসের বই খুলে ঘোড়ার নাম দেখতে দেখতে ফিরে তাকায় সবল মুন্সী। বলে, কি দাদা, বউদি কেমন আছে?

প্রশ্নের পিঠে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

মুকুন্দবাবু টেরী কাটা চুলে মহাভৃঙ্গরাজ মাখতে মাখতে বলেন, ভৈরববাবু ফিরেছেন দেখছি। ভাবছিলাম এবারটা হয়তো আঁচলে বাঁধা থাকবেন।

ছোকরা অনুপম কলেজ থেকে ফেরার মুখে ভৈরবের ঘরে উঁকি দেয়। বলে, সে কি, এবারও একা? ভাবলাম বউদিকে বুঝি সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন।

ভৈরব শোনে আর হাসে। ভালও লাগে। রসিকতা করে বলে, বিয়ে তো একদিন করবে ভাই, তখন বুঝবে।

আবার সারা সপ্তাহ ধরে তৈরী হতে শুরু করে ভৈরব। ছেলে-মেয়েদের ফাই-ফরমাশ, স্ত্রীর বায়না। একটি একটি করে খুঁটিনাটি জিনিস কিনে এনে থলিতে ভরে রাখে।

তারপর আবার সেই শনিবারের দুটো তিরিশের ট্রেন। সেই মেমারী স্টেশনে নেমে একটা খুশীর গুনগুনুনি।

প্রতিবারের মতোই সেদিনও পায়ের গতি কমে এলো। পুরনো দোতলা দালানখানা দেখা যাচ্ছে। দেখা গেলেই ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে ভৈরব। স্বপ্নের ঘোরেই যেন এতক্ষণ কেটে গেছে তার। স্বপ্নের ঘোরেই সারা সপ্তাহটা কেটে যায়।

কিন্তু বাড়িটার সামনে পৌঁছেই হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলো ভৈরব। বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো বুঝি। ঠিক

সেই দিনটির মতো, যেদিন বিয়েবাড়ির আনন্দ আর উল্লাস দেখেছিলো পড়ো বাড়িটাকে ঘিরে! কিংবা তার চেয়েও বেশী।

নিজেরই অজান্তে কখন পা থেমে গিয়েছিলো। বার বার জানালাটার দিকে তাকালো ভৈরব। জানালার আশেপাশে। সমস্ত বাড়িটার ওপর চোখের দৃষ্টি ঘুরে গেলো।

না, জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে! কেউ আর সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে নেই। একটুকরো মৃদু হাসির অভ্যর্থনা, তাও নিবে গেছে ভৈরবের জীবন থেকে।

সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে গেলো। হনহন করে পথটুকু হেঁটে পার হয়ে গেলো ভৈরব। বুকের মধ্যে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রতিবারের মতোই কানা-উচু কাঁসার থালায় দুখানা পরোটা আর গুড় নিয়ে এসে নামিয়ে রাখলো ভৈরবের স্ত্রী। জিগ্যেস করলে, আমার জর্দাটা এনেছো?

ভৈরব তিক্ত স্বরে উত্তর দিলে, ওই তো আছে, ব্যাগটা খুলেই দেখো না।

ছোট মেয়েটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানে সরে গেলো সেখান থেকে। ভৈরব তাকিয়েও দেখলে না।

বড় ছেলেটা মাদুর পেতে হারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে এসে বসলো। বললে, অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না বাবা।

ভৈরব একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলে, ইস্কুলের মাস্টার মশাইকে বলিস বুঝিয়ে দিতে।

কত বড় বড় বেগুন ধরেছে গাছে। নারকেলের চারাটা কত বড় হয়েছে, কোন কিছুই দেখতে ইচ্ছে হলো না ভৈরবের।

ক্লান্তিতে বিরক্তিতে দেড়টা দিন কাটিয়ে দিয়ে সোমবার সকালেই আবার ফিরে এলো ভৈরব। আসার পথে ভালো করে তাকিয়ে

দেখলে দোতলা দালানটার দিকে। না, জানালাটা তেমনি বন্ধ আছে। কপাটে একটা বড় কুলুপ ঝুলছে।

একটা সপ্তাহ কেটে গিয়ে আবার শনিবার এলো। কিন্তু ভৈরব যেন সে খবর জানে না।

শনিবার সকালে ভৈরব তখনো শুয়ে আছে তক্তপোশের ওপর। সরল মুন্সী সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত স্বরে বললে, কি ব্যাপার, এখনো ঘুমোচ্ছেন যে! ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়েছেন?

ভৈরব কোন জবাব দিলে না।

মুকুন্দবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে কি একটা রসিকতা করতে এসে থমকে দাঁড়ালেন।—আরে, ভৈরববাবু আজ বাড়ি যাবেন না নাকি? এর মধ্যেই স্ত্রী পুরনো হয়ে গেলো?

কলেজ যাবার মুখে একবার উঁকি দিয়েই থেমে পড়লো ছোকরা অনুপম।—ভৈরবদা কি বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন নাকি? বউদির সঙ্গে আপনারও তাহলে মন-কষাকষি হয়!

ভৈরব একে একে সকলের কথাই শুনলো, কিন্তু কোন কথার জবাব দিলে না। ওর তখন চোখ ঠেলে জল আসছে, একটা [illegible], আক্রোশে। নিজের ওপরেই একটা অসহ্য অভিমান। [illegible] ছেলেমেয়ে, সেই বেগুনের চারা, একটু একটু করে বেড়ে[illegible] নারকেল গাছটা—সেই ছোট্ট সংসারের সমস্ত আনন্দ যে জা[illegible] ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছে সে এতদিন, সেই জানালাটাই যে [illegible] বন্ধ হয়ে গেছে।

[১৩৬২]

ওর চরিত্রে এটা যে একটা বড় খুঁত তা গাঙ্গুলী বাড়ির ছোট বউ উমার কোনদিনই মনে হয় নি। আড়ালে বড় এবং মেজ জা ওর ওই আদেখ্‌লেপনা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে, ননদরা মুখ ফুটে এবং ঠোঁট বেঁকিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলেও ফেলেছে কখনো কখনো। বিরাম নিজেও অনেকদিন সহ্য করেছে, তারপর যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে বলেছে, যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, তা নইলে দুঃখ পাবে।

আঠারো বছরের নতুন বউ উমা বিরামের কথায় খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছে, মশাই নিজে কেন তা হলে চাকরিতে প্রোমোশন হলো না বলে মুখ গোমড়া করেছিলে, শুনি ?

বি[illegible] আরো বিরক্ত হয়েছে ওর কথায়। বলেছে, তোমার খরচটাও যে টানতে হয়, তাই। এই মাইনেতে যদি চলতো তা হলে [illegible]তাম না।

এ-কথায় উমার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে, চোখের চাউনি তীব্র। [illegible]ছিপে শরীরটায় ডুরে শাড়ির আঁচলটাকে আরো টেনে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ও, বলেছে, বিয়ে না করলেই পারতে। এতো ভার [illegible]ইতে পারো তালাক দিয়ে দাও, চলে যাই।

তা শুনে হেসে ফেলেছে বিরাম, কিন্তু জবাব দিতে পারে নি। [illegible]রণ সত্যিই তো উমার কোন হাত ছিলো না এ বিয়েতে, বিরাম নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে। বাপ-মা গিয়ে কনে দেখে এসেছিলো প্রথম, তারপর বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে বিরামও গিয়েছিলো দেখতে।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাপ ইউ ডি ক্লার্ক ছিলো, বছর দুয়েক

বড়বাবু হয়েছে। বাড়ির অবস্থা যে ভালো নয়, তা মেয়ে দেখতে গিয়ে ঘরখানাকে এক নজরে দেখেই বুঝতে পেরেছিলো বিরাম। সচ্ছলতা এবং রুচির অভাবটা বেশী করে চোখে পড়েছিলো। যে ঘরখানায় গালিচা পেতে ওদের বসতে দেওয়া হয়েছিলো সে ঘরের সঙ্গে গালিচাটা ছিলো একেবারে বে-মানান। এমন কি চায়ের পেয়ালাগুলো, মনে হয়েছিলো, প্রতিবেশী কোন বাড়ি থেকে চেয়ে আনা। প্রথমটায় তাই মন বিরূপ হয়ে উঠেছিলো বিরামের। মুক্তারামবাবু স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে গলিটা, এমনিতেই আলো হাওয়া ঢোকে না ঘরে। যা-ও বা ঢুকতো, জানালার ধারে একটার ওপর আরেকটা ট্রাঙ্ক সাজিয়ে এবং তার ওপর লেপ তোশক বালিশের রাশি রেখে আলো এবং হাওয়া দুটোরই পথ আটকে দিয়েছে। ছোট্ট ঘর। তার একপাশে একখানা নক্শা-কাটা ধুলো-জমা খাট, একটা পাল্লা-বেঁকে যাওয়া আলমারি। আলমারির গা-চাবি খারাপ হয়ে যাওয়ায় দুটো কড়া লাগিয়ে তাতে বড় একটা কুলুপ লাগানো। আর খাটের তলায় দুটো বড় বড় ঘড়া, একরাশ বাসনপত্তর। দেয়ালে তিন দিকে পাঁচটা নানা সাইজের ক্যালেণ্ডার, একটা ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটের কাজ। আরেকটা কালো ভেলভেটে রঙিন সুতোয় 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' লেখা শ্লোক, তাও ফ্রেমে বাঁধানো। কপাটের মাথায় একখানা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি। পাশেই এক বুড়ো ভদ্রলোকের ফটো—কাচের ওপর থেকেই তার কপালে চন্দনের ফোঁটা আঁকা হয়েছে।

লাজুক লাজুক চোখে মাথা নিচু করে উমা যখন এসে বসেছিলো গালিচায়, তখন কিন্তু আরো বেখাপ্পা বেমানান মনে হওয়া উচিত ছিলো বিরামের। হয় নি। ও বরং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। না, রূপে উর্বশী মনে হয় নি উমাকে। কিন্তু ওর লাজুক নম্র চোখে কিশোরী কোমল চেহারায়, আর ঈষৎ কালো ঠাণ্ডা মুখশ্রীতে কি জাদু ছিলো

কে জানে, বিরামের মনে হয়েছিলো ঠিক এমনিটিই যেন ও চেয়েছিলো।

কি আশ্চর্য সে মেয়েটার ভেতর যে এত সব লুকিয়ে ছিলো কে জানতো। কিংবা সিঁথেয় সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় মেয়েটা বদলে গিয়েছিলো।

বিয়ের পর বিরামদের বাড়িতে দুটো সপ্তাহও কাটে নি, জানালার পাশটিতে বিরাম আর উমা দাঁড়িয়ে দেখছে সামনের বাড়ির কার্নিসে দুটো কাক ভিজছে বৃষ্টিতে, হঠাৎ উমা বলে উঠলো, ওদের বাড়িটা কি সুন্দর, না? আমার ভারী ইচ্ছে করে অমনি একটা বাড়িতে থাকবো।

তখন বিরামের চোখে নতুন বিয়ের ঘোর লেগে আছে, তাই ও শুধু হেসেছিলো, বলেছিলো। মাইনেটা বাড়লে আমরাও নয় অমনি একটা বাড়িতে উঠে যাবো।

—বা রে, তা কি করে যাবে? বুঝতে না পেরে বড় বড় ঠাণ্ডা দুটো চোখ মেলে উমা তাকিয়েছিলো বিরামের মুখের দিকে।

বিরাম হেসে বলেছিলো, বেশী ভাড়া দিলেই পাওয়া যাবে অমন বাড়ি।

একটু বাড়িয়েই বলেছিলো বিরাম, না বলে উপায় ছিলো না বলে। যদিও ও মনে মনে জানতো ওর চাকরিতে যত উন্নতিই হোক, ও-বাড়ির মতো আর সুন্দর বাসা ও কোনোদিনই করতে পারবে না। তবু এই একটা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে উমাকে ভোলাতে চেয়েছিলো।

অথচ উমা কিনা নাক সিঁটকে বলে বসলো ভাঙা বাড়ি! ভাঙা বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার বড় জামাইবাবু কি সুন্দর বাড়ি করেছে শ্যামবাজারে!

কথাটা বুকে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলো। মুহূর্তের জন্যে হলেও কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলো বিরাম। আর এই আঘাতটা

ভুলতে পারে নি বলেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলো। সুযোগ খুঁজছিলো নতুন কোন স্বপ্ন দেখিয়ে উমার মন থেকে তার দুর্বলতাটুকু মুছে ফেলার।

কথায় কথায় একদিন বলেওছিলো। খাটের ওপর মুখোমুখি দুজনে আধশোয়া হয়ে একটা ছবির কাগজ দেখছিলো সেদিন। তার একটা পাতায় সুন্দর একখানা ছোট্ট বাংলো টাইপের বাড়ির ছবি। ছোট্ট বাড়ি, দুখানা হয়তো ঘর, সামনে এক-টুকরো বাগান। ছবিটা দেখিয়ে বিরাম বলেছিলো, এবার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা দিয়ে দেব। মাইনে বাড়লে মাসে মাসে কিছু কিছু করে জমাবো তারপর এমনি একটা ছোট্ট বাড়ি করবো আমাদের—একতলা বাড়ি, দুখানা ঘর, ছোট্ট একটা বারান্দা, বারান্দায় মাধবীলতার ঝাড় লাগিয়ে দেবো একটা।

আরো অনেক কিছুই হয়তো অনর্গল বলে যেত বিরাম, তার আগেই উমা বলে উঠলো, এ মা এমনি ছোট্ট বাড়ি? ছোট বাড়ি আমার একদম পছন্দ নয়, একদম না। কেন, বড় রাস্তার মোড়ের ওই নতুন বাড়িটার মতো করতে পারবে না? খুব বড় বাড়ি হবে, অনেক লোক থাকবে, একরাশ ঠাকুর চাকর ঝি—রেডিও বাজবে···।

উমার আকাঙ্ক্ষার যেটুকু তখন মেটাবার মতো সামর্থ্য, শুধু সেইটুকু দিয়েই তাকে খুশী করতে চেয়েছিলো বিরাম। একদিন তাই সত্যি সত্যি আপিস থেকে কয়েকশো টাকা লোন নিয়ে রেডিও সেট একটা কিনে আনলে। ভেবেছিলো উমাকে চমকে দেবে, উমা খুব খুশী হবে।

প্রথমটা খুশী হয়েছিলো উমা। এরিয়েল টাঙিয়ে রেডিওটা যখন চালু করলে বিরাম, তখন কি ফুর্তি তার। রেডিওর 'নব' নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরায়, তখনই গান, তখনই গুরুগম্ভীর বক্তৃতা, কখনো তীব্র

চীৎকার, কখনো অস্পষ্ট গানের কলি। যেন কতবড় কৌতুক, হাসিতে খিলখিল করে ওঠে।

বিরামের মেজো বোন শর্মিলা এসে ঠোঁট টিপে হাসলো, তারপর টিপ্পনী কাটলো।—বাবা, এতদিন তো দাদার রেডিও কেনার পয়সা ছিলো না!

বিরামের মা এসে এক সময় উমাকে বললেন, বউমা, বিরুকে বলো শখ মেটানোর বয়স এখনো অনেক আছে, এখন থেকে এতো পয়সা নষ্ট করলে পরে অনেক দুঃখ পেতে হবে।

শুধু বিরামের বাবা বললেন, তা ভালোই করেছে বিরু, বউমা বেচারী সারাটা দিন একা একা থাকে···।

ননদ দুজন অবশ্য সে কথা শুনে উমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, একা একা? কেন দুপুরে আমরা কি আপিসে যাই নাকি? না, বাবা মা থাকে না?

উমা এসব শুনে মনে মনে চটলো বটে, কিন্তু বিরামের ওপর খুশী হয়ে উঠলো। তার জন্যেই তো রেডিওটা কিনে এনেছে বিরাম, এতদিন তো আনে নি। তাই ভেতরে ভেতরে ও যা ভেবেছিলো, সেটুকু প্রকাশ করলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা চাপা রাখতে পারলো না। বিরাম তখন সদ্য আপিস থেকে ফিরেছে, চায়ের কাপটা এনে বিরামের সামনে রেখে রেডিওটা খুলে দিতে গেলো ও। কিন্তু যেখানেই কাঁটা ঘোরায়, হয় বক্তৃতা, নয় খবর, নয় অন্য কিছু।

বিরক্ত হয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে ও বিরামের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়লো, বললে, আচ্ছা এই ছোট্ট রেডিওটা আনলে কেন বলো তো? দিদির বাড়িতে একটা আছে অনেক বড়, তাতে রেডিও হয়, আবার রেকর্ড বাজানোও চলে, তেমনি একটা···।

বিরাম একবার শুধু ফিরে তাকালো উমার মুখের দিকে, কোন

কথা বললো না। বেশ বোঝা গেলো ও চটেছে, কিন্তু কেন যে চটেছে বিরাম, তা উমা বুঝতে পারলো না। এমন কি অন্যায় কথা বলেছে ও? সারাদিনের কাজের পর রোদে পুড়ে এসেছে বিরাম, রেডিওর গান না থাক, এখন একটা রেকর্ড বাজাতে পারতো ও। ক্লান্ত মানুষটার চোখে চোখ বেখে হাসি হাসি মুখে বাজনার তালে তালে পেয়ালাব গায়ে চামচটা দিয়ে ঠুনঠুন করে বাজাতে তো পারতো? কিন্তু বিবাম ওব অতশত স্বপ্নের খবর রাখবে কি করে। লোনেব টাকাটা তখনও থেকে থেকেই ছারপোকার মতো কামড়াচ্ছে। তাই একটু ঘা খেলো বিবাম মনে মনে, তবু চুপ করে রইলো।

কিন্তু বিরাম কিছু না বললে কি হবে, শর্মিলা আর ঊর্মিলা দু-বোন শোনাতে ছাড়বে কেন। উমাকে সঙ্গে নিয়ে পূজোর শাড়ি কিনতে গেছে বিবাম, সঙ্গে গেছে দু-বোন। আর এত শাড়ি থাকতে কিনা এমন একখানা পছন্দ হয়েছে উমার, যেটাব দিকে বিরামের ফিরে তাকাতেও সাহস হয় নি।

তাও চাইতো না বিরাম, কিন্তু উমা ফস করে বলে বসলো, জানো, দিদি ঠিক এমনি একটা ঢাকাই শাড়ি কিনেছিলো ওর ভাসুরপোর বিয়েতে যাবার জন্যে। এটা পেঁয়াজী রঙের আর সেটা ছিলো ফিকে সবুজ, কিন্তু সেটার ওপরও এমনি সাদা সাদা ফুল ছিলো···।

শর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, তোমার বাবার মত বড়লোক তো নয় আমার দাদা!

কথাটা চাবুকের মত লেগেছে উমার, সারা মুখ অপ্রতিভ হয়ে গেছে ওর। ওর বাবা যে গরীব তা তো সবাই জানে, বাবার কথা তো বলে নি উমা, বলেছে দিদির কথা। জামাইবাবু বড় চাকরি করে, একটা ঢাকাই শাড়ি দিতে পারবে না কেন দিদিকে?

উমা অবশ্য পরমুহূর্তেই ওর অন্যায় বুঝতে পেরেছে, সত্যিই তো,

জামাইবাবু বড়লোক হতে পারে, তা বলে বিরাম কোত্থেকে অতো টাকা পাবে। না, এরপর আর কোনোদিন না-ভেবেচিন্তে কথা বলবে না।

দিনকয়েক ও সত্যি সত্যিই খুব সাবধানে থেকেছে। যা মনে এসেছে চেপে রেখেছে। কি জানি কোন্ কথার কি মানে করে বসে ওরা।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে নি।

সামনের বাড়ির বউটি বেড়াতে এসেছে একদিন। বউটিকে এতো সুন্দর কোনোদিন তো মনে হয় নি ওর। ঠিক যেন একটা গোলাপী পদ্ম। আর কি অপূর্ব লেগেছে তাকে বেনারসী শাড়িটায়। কিন্তু তার চোখ নাক চিবুকের সৌন্দর্য, তার শাড়ির ঘটা, এসব ছাড়িয়ে উমার চোখ কখন গিয়ে পড়েছে গলার জড়োয়া নেকলেসে। এমনিতেই গোলগাল স্বাস্থ্য বউটির, চওড়া মুক্তোর নেকলেসটা কণ্ঠি থেকে প্রায় ছ আঙুল বুক ঢেকে আছে। কি অপরূপ যে লেগেছে তাকে!

গল্প করতে করতে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসেছে উমা, তারপর তার গলার নেকলেসে হাত দিয়ে দেখেছে। কিছুতে হাত সরাতে ইচ্ছে হয় নি যেন। ইচ্ছে হয়েছে একবার খুলে নিয়ে নিজে পরে। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে কেমন মানায়।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাই মুখে বলছে কি সুন্দর প্যাটার্ন ভাই। বলে উর্মিলার দিকে তাকিয়েছে। তারপর শর্মিলা আর উর্মিলার ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনায় হঠাৎ চুপসে গিয়েছে উমা।

তবু সেই মুহূর্তেই ওর মুখ দিয়ে কেন কে জানে বেরিয়ে পড়েছে—দিদির ঠিক এমনি একটা আছে, শুধু লাল পাথরের জায়গায় সবুজ।

তা শুনে শর্মিলা আরো চটে গেছে। দিদি, দিদি, দিদি। কেন বলতে পারতো না, উর্মিলার অমনি একটা আছে!

কিন্তু শেষ অবধি ওর এই স্বভাবের জন্য যে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাবে উমাও ভাবতে পারে নি। অথচ ব্যাপারটা একেবারেই তুচ্ছ। এতই তুচ্ছ যে কাউকে বলাও যায় না।

পিসতুতো বোনের বিয়ে। আর তাই বিরামই ওকে প্রশ্ন করেছিলো, কি দেয়া যায় বলো তো ?

উমা শুনেছিলো, বিরাম নাকি ছোটবেলায় পিসীমার কাছেই থেকে পড়াশুনো করেছিলো। পিসীমা নাকি বিরামকে খুব ভালবাসেন। তাছাড়া বিরামের এই পিসতুতো বোনটিকে উমারও খুব ভালো লেগেছিলো।

তাই বিরাম জিগ্যেস করতেই ও বলেছিলো, কানের দুল দাও না একজোড়া, সে-ই খুব ভালো।

বিরামও রাজী হয়েছিলো। সত্যিই তো, সোনার কিছু একটা দেয়াই উচিত ওর। শর্মিলা ঊর্মিলা, বিরামের মা, সকলেই একমত।

শেষ পর্যন্ত উমাকে সঙ্গে নিয়েই গহনার দোকানে গিয়েছিলো বিরাম। বেশ একটা বড়োসড়ো দোকানে। আর দামের অঙ্কটা জানিয়ে বিরাম যখন একজোড়া কমদামী দুল প্রায় পছন্দ করে ফেলেছে, তখন হঠাৎ বেঁকে বসলো উমা। উজ্জ্বল আলোয় শো-কেসের কাঁচের নীচে সারি সারি আংটি, দুল, নেকলেস সাজানো। আর সেইদিকে এতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলো উমা।

বিরাম তার পছন্দমতো দুলজোড়া দেখিয়ে জিগ্যেস করলে, এটাই নিই, কি বলো ?

সঙ্গে সঙ্গে উমা দোকানদারের সামনেই বলে উঠলো, দূর। ও কি দেয়া যায় নাকি কাউকে, ও ঘরে পরবার জন্যে। বলেই শো-কেসের একজোড়া পাথর বসানো দুল দেখিয়ে বললে, দিদি না, ওর বন্ধুর বোনের বিয়েতে ঠিক এমনি একজোড়া দুল দিয়েছিলো, কি সুন্দর দেখো!

বিরাম একবার সেই দুলজোড়ার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বোধ হয় দামটা আঁচ করে নিলো আর পরমুহূর্তেই রাগে ফেটে পড়লো। ক্রুদ্ধ চোখেব দৃষ্টিটা একবার উমার মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে কম দামী দুল জোড়াই কিনলো, তারপব দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললে তোমার দিদি কাকে কি দিয়েছে সেটুকুই তোমার মনে থাকে, কই তোমাব বাবা তোমাকে কি দিয়েছেন, সে-কথাটা তো মনে থাকে না।

কথাটা শুনেই ভেতবে ভেতরে জ্বলে উঠেছে উমা। জ্বলে উঠলো, তার কারণ কথাটা মিথ্যে নয়। উমাব বাবা যে গরীব তা কি উমাই জানে না। ওর বাবা যে ওকে বিশেষ কিছুই দিতে পারেন নি, সে তো উমারও লজ্জা। কিন্তু সে কথাটা এত স্পষ্ট করে রূঢ় ভাষায় না বললে চলতো না?

সারা পথ একটা কথাও বললো না উমা। শেষ অবধি হয়তো ওর রাগ পড়ে যেতো, কিন্তু বাড়ি ফিরে কেনা দুলজোড়া শর্মিলা আর উর্মিলাকে দেখাতে দেখাতে বিরাম টিপ্পনী কাটলে, তোদের বউদির আবার হীরের দুল না হলে পছন্দ হয় না, এতো কমদামী দুল দিতে ওর লজ্জায় নাক কাটা যাচ্ছে।

শর্মিলাও ছাড়তে রাজী নয়। বললে বড় লোকের মেয়ে কিনা! সেদিন সামনের বাড়ির বউটা ঘটা করে শাড়ি গয়না দেখাতে এসেছিলো, কোথায় ও-সব কিছু লক্ষ করি নি এমন ভাব করে বসে আছি আমরা, বউদি এমন করতে শুরু করলো যেন জীবনে মুক্তোর হার কোথাও দেখে নি। অথচ বললে কিনা ওর দিদির ওই রকম একটা জড়োয়া নেকলেস আছে!

বাস, এইটুকুই। কিন্তু এই ছোট্ট একটু স্ফুলিঙ্গ থেকে কিভাবে যে বিস্ফোরণ ঘটে গেলো বোঝা দায়! দু পক্ষেরই রাগ একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকার করে বিদ্রোহ

জানালো উমা, এবং চিঠি লিখে বাবাকে আনিয়ে পরের দিনই চলে এলো মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের সেই গলির বাড়িতে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি তা বাবা মাকে বলতে পারলো না। এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার কি করে বলবে ও। তা ছাড়া বাপের বাঁড়িতে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর রাগ পড়ে গিয়েছিলো। কেমন যেন লজ্জাও করছিলো ওর। বাবা-মা কি ভাবছেন কে জানে। গোপন ব্যথাটা প্রকাশ করে কাউকে বলতে না পেয়ে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়লো ও। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে জানালার ধারে, আর কেবলই মনে হয়, বিরাম আসবে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

না, বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো, তবু বিরাম এলো না। পরিবর্তে একদিন ওর দিদিই এসে হাজির হলো। ভাবলে, কিছু একটা মান-অভিমানের পালা চলছে নিশ্চয়। তাই বললে, চুপচাপ এখানে একা একা রয়েছিস, তার চেয়ে চল্ না আমার কাছে দিনকয়েক থাকবি।

একটু থেমে আবাব বললে, যাবি তো বল, একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলি।

—ট্যাক্সি? হঠাৎ হেসে উঠলো উমা, একটা গাড়ি কিনতে বল না জামাইবাবুকে। আমার বড় নন্দাই সেদিন এসেছিলো, একটা নতুন গাড়ি কিনেছে। কি চমৎকার না গাড়িটা। অনেক দাম, আজকাল নাকি পাওয়াই যায় না! আসছে বছর আমরাও···।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কি যেন বলার ইচ্ছে ছিলো উমার। কিন্তু দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলো। আর ওর দিদি তখনো স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উমার চোখের দিকে, একটু আগে কথা বলতে বলতে যে চোখ জোড়া লোভে চকচক করে উঠেছিলো, তার দিকে।

[চলবে]

লালচাঁদ রোজাকে প্রথম দেখেছিলাম বেলাংডিহির ঝাঁপানে। আষাঢ় পঞ্চমীতে মেলা বসতো, লোক থিকথিক করতো মেলাতলায়। কাঁধের বাঁকে সাপের ঝাঁপি সাজিয়ে দূর দূর গাঁ থেকে আসতো বেদের দল। সাপ খেলাতে পূজো দিতে আসতো তারা বিষহরি জগৎগৌরী মায়ের থানে। আসতো গান গেয়ে, জরিবুটি বিষ-পাথর বেচে দু-পয়সা রোজগার করতে।

মদন মাল, লখাই সর্দার, কান্তু বেদে—ওরা সব এখন সারি দিয়ে বসেছে, সাপখেলা দেখাচ্ছে সামনে লাল গামছা বিছিয়ে। যার যা ইচ্ছে দুচার পয়সা ফেলে দিচ্ছে গামছায়, আর সিঁদুরটুপি সাপের ফণায় টোকা দিয়ে দিয়ে বাঁ-হাতের শূন্য মুঠিটা ডুগডুগির মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওস্তাদ একজন বলছে, আসল লাগ বটে গো, সিঁদুরটুপি লাগ। কামালো লাগ লয়।

অর্থাৎ বিষ কামানো সাপ নয়।

ওস্তাদকে বললাম, সাপের মন্ত্র শিখিয়ে দেবে ওস্তাদ?

সে হেসে উঠলো, তারপরই ইশারায় দেখিয়ে দিলো যার দিকে, কে জানতো সে-ই লালচাঁদ রোজা।

মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বুক পর্যন্ত পাকা দাড়ি, গায়ে একটা গেরুয়া রঙে ছোপানো ফতুয়া, কোমরে শক্ত করে গিঁঠ দিয়ে বাঁধা কাপড়টাও গেরুয়া রঙের, লুঙ্গির মতো করে পরা। কাঁধে একটা ঝোলা। আর চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, পাক দেয়া দড়ির মতো শুকনো চেহারা।

লালচাঁদ কাছে আসতেই ফণা তোলা সাপটাকে ঝাঁপির ঢাকনায় চেপে দিয়ে দু হাত কপালে ঠেকালো ওস্তাদ, বললো গড় হই গো বাবাঠাকুর।

সঙ্গে সঙ্গে মদন মাল, লখাই সর্দার, কান্তু বেদেও বলে উঠলো, পেন্নাম গো বাবাঠাকুর, পেন্নাম।

তারপর ওস্তাদ হেসে উঠে আমাকে দেখিয়ে বললে, লাগের মন্তর চায় গো ই খোকাবাবু।

আমার তখন কতোই বা বয়স। তেরো কি চোদ্দ। বেলাংডিহির পাশের গাঁ পলাশবনিতে মামার বাড়িতে থেকে ইস্কুলে পড়ি। সাপের মন্তর শেখার তখন ভারি শখ।

লালচাঁদ হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, দিব, দিব বাপ, আসল লাগ চিনায় দিব, লাগবন্দী মন্তর শিখায় দিব। খড়ি গুনতে শিখায় দিব, বিষ লামানোর মন্তর শিখায় দিব, বিষপাথর চিনায় দিব। সাগরেদ হবি বাপ?

বলতে বলতে বটতলার দিকে চোখ পড়লো লালচাঁদের। বেদেনীর দল সেখানে তখন জটলা পাকিয়ে গান গাইছে। ভিড় করে শুনছে মেলার লোক।

সে গান শুনে আমরা ক-বন্ধু হেসেই খুন। কি গানের বাহার। কেবল মাঝে মাঝে ধুয়ো উঠছে : মরি হায় রে!

একটা বছর-পনেরো বয়সের মেয়ে অবার নাচ জুড়ে দিয়েছে। নাচছে একবার করে আর গাইছে :

লাগের সাগর লাগর ভাগর
লদে লৌকা বায়রে!
মরি হায় রে!

লালচাঁদেরও চোখ পড়েছিলো মেয়েটার দিকে। হঠাৎ হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলো লালচাঁদ, বললে, ই কে বটে রে? লতুন লতুন লাগে?

কান্তু বেদে লজ্জায় মাথা নীচু করে হেসে বললে, আমার বেটী গো। পার্বতী!

—কান্তর বেটী তুই ? পার্বুতী ? চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকালো লালচাঁদ, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

না হবারই কথা, কারণ এক বছর আগে এই বিষহরির থানেই আমরাও দেখেছিলাম কান্ত বেদের মেয়েকে। একটা বছরে ও যে এত বড় হয়ে গেছে ভাবাই যায় না।

মেয়েটার গানের গলা-ও ছিলো খুব মিষ্টি।

সন্ধ্যের সময় আমরা ক-বন্ধু যখন গাঁয়ে ফিরছি, তখন ওর গলার সুর নকল করে আমরাও গাইছি :

কোলেতে লইয়ে মরা পতি
কলার মান্দাসে বেউলা সতী
বলে, মায়ের থানে আমি যাইরে!
জলে জলে ভেসসা চলে
পরাণে সতীর ডর লাইরে।

একটা করে কলি গেয়ে উঠি আর হেসে লুটোপুটি খাই।

কিন্তু লালচাঁদ রোজাকে কিছুতেই যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। ওর সম্পর্কে কেমন একটা বিস্ময় আর কৌতূহল তখন আমাদের মনের মধ্যে চেপে বসে আছে।

লালচাঁদ রোজা, লালচাঁদ রোজা! চারপাশের গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে যার কথা এতদিন শুনে এসেছি সেই মানুষটিকে এতদিনে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা ?

গাঁয়ে ফিরে মামাকে মামীকে, গাঁয়ের সবাইকে, বিশেষ করে দিদি-মাকে না শুনিয়ে স্বস্তি নেই যেন। চোরদিঘির সামন্ত গিন্নী নাকি গলার হার খুলে দিয়েছিলো লালচাঁদকে, তার ছেলেকে বাঁচিয়েছিলো বলে। জনপুরের চাটুজ্যেরা দিয়েছিলো গরদের পাগড়ি আর একশো রূপোর টাকা। মোমিনগাঁয়ের ছোট হাজী দিয়েছিলো দশ ভরি রূপোর রেকাবি-ভর্তি টাকা আর শাল। আরো কতো গল্প যে শুনতাম।

ভারি ইচ্ছে হতো, লালচাঁদ কি করে বিষ নামায়, সাপে কাটা মানুষ বাঁচায়, নিজের চোখে দেখবার। কিন্তু আমার বাসনা যে এমনভাবে সফল হবে কে জানতো! এমনটি তো আমি চাই নি।

সেদিনের কথাটা বলতে গেলেই সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

আমি তখন সবে ইস্কুলে গিয়েছি। গাঁয়ের ইস্কুল, মাস্টারমশাইরা তখনো সকলে এসে পৌছন নি। আমরা সবাই হইহই করছি। হঠাৎ কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে বললে, বীরু তোর দিদিমাকে লতায় কেটেছে!

লতায় কেটেছে? বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। চোখ ফেটে জল এলো। এত লোক থাকতে শেষে কিনা দিদিমাকে সাপে কাটলো?

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। পিছনে পিছনে আরো অনেকে।

এসে দেখি ভিড় জমে গেছে উঠোনে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু আর এগোতে পারলাম না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো মরাইতলায়।

দেখলাম রান্নাঘরের উঁচু দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দিদিমা চুপচাপ বসে আছে মাথা নীচু করে। বাঁ হাতটার কাঁধ অবধি দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা হয়েছে যে ফাঁকে ফাঁকে মাংস কেটে বেরিয়ে আসার উপক্রম।

মামাকে ধারে কাছে দেখতে পেলাম না, শুধু দেখলাম, পৈঠের ওপর বসে অঝোরে কাঁদছেন মামীমা, দুচোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

গাঁয়ের লোক যার যা খুশি উপদেশ দিচ্ছে, দু-একজন হইহই করছে, আর সকলে চুপচাপ। ভয়ে আতঙ্কে যেন থমকে গেছে সকলে।

আমার বুকটাও তখন ধকধক করছে। কি হয়, কি হয়! এতো লোকজন, কিন্তু সব মিলে কেমন একটা থমথমে ভাব।

আস্তে আস্তে শুনলাম সব খবর। পূজোয় বসেছিলেন দিদিমা। ঠাকুর ঘরের একপাশে চৌকির ওপর রাখা চালের বস্তা, গুড়ের নাগরি। পূজো করতে করতে আনমনে বাঁ হাত বাড়িয়ে সেই চৌকির তলা থেকে পূজোর বাসন বের করতে গেছেন দিদিমা, অমনি মনে হয়েছে কিসে যেন কামড়ে দিলো। তখনও বুঝতে পারেন নি, বুঝতে পেরেছেন একটু পরেই চন্দ্রবোড়া সাপটাকে ধীরে ধীরে চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে।

সাপটা চৌকাঠ পার হয়ে নতুনগোড়ে পুকুরটার দিকে চলে যেতেই চিৎকার করে উঠেছেন দিদিমা।—ও বউ, বউ, আমায় সাপে কামড়েছে, চন্দ্রবোড়া সাপে?

চন্দ্রবোড়ায় কেটেছে? তা হলে কি আর কোন আশা আছে? চোখ ঠেলে কান্না এলো আমার। ইচ্ছে হলো ছুটে যাই দিদিমার কাছে, মামীমার কাছে, জিগ্যেস করি সবাই যা বলাবলি করছে সত্যি কিনা। কিন্তু পারলাম না। সমস্ত পরিবেশটার মধ্যে কি যেন ছিলো, তাই আমাকেও ভিড়ের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার উঠলো, জয় বিষহরি জগৎগৌরীর জয়!

রুক্ষ কর্কশ গলার চিৎকার ভেসে এলো বাইরের দরজা থেকে।

সবাই চমকে ফিরে তাকালো। আমিও।

আর পরমুহূর্তেই যাকে দেখতে পেলাম, একবারও আশা করি নি, সে এই মুহূর্তে এসে পড়বে।

রোজা লালচাঁদ।

সেই বুক পর্যন্ত দাড়ি, গেরুয়া পাগড়ি, লাল চোখ আর পিঠে ঝোলা।

এসেই হাসি হাসি মুখে বললে, ডর নাই গো মা-ঠাকরুন, ডর

নাই। ওস্তাদের নিদ্দেশ, মা জগৎগৌরীর নিদ্দেশ, লাগে কেটেছে শুনলে সব ফেলে ছুটো আসতে হবে বাপ। কাঁদর পাড়ে খপর শুনেই ছুট্যে এয়েছি বাপ।

বলেই কাঁধের ঝোলা নামিয়ে খড়ি আর পাতা বেব করে মাটির ওপর আঁকজোক কাটতে শুরু করলে লালচাঁদ আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জন উঠলো। মনেব মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ।

মনে হলো, জগৎগৌরী বিষহবি নিজেই যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন লালচাঁদ রোজাকে। সকলের চোখেই এতক্ষণে আশা দেখা দিলো। লালচাঁদ যখন এসে পৌছেছে তখন আর কোন ভয় নেই।

দিদিমাও একটু মুখ তুলে তাকালেন। সাপে কেটেছে, সে যেন দিদিমার নিজেরই লজ্জা। তাই মুখ নীচু করে এতক্ষণ বসে ছিলেন! লালচাঁদের কথা শুনে এবার মুখ তুলে তাকালেন। মনে হলো দিদিমা যেন হাসলেন। সে-হাসিতে আশা আর আনন্দ খেলে গেলো। যেন এতক্ষণে একটা ভবসা খুঁজে পেয়েছেন।

দিদিমার চেহারা ছিলো খুব সুন্দব। যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি ফরসা। মাথার চুল সব সাদা।

লালচাঁদ খড়ি পাতা শেষ করে দিদিমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, আ বাপ, তুমায় কাটলো চন্দবোড়া লাগে? সোনার পদ্ম রূপ যে মাগো, ই যে সাক্ষাৎ বিষহরি গৌরী মা আমার!

বলে ধীরে ধীরে উঠানে দিদিমাকে শুইয়ে দিল লালচাঁদ। হাতের বাঁধন খুলে ঝোলা থেকে শিকড়বাকড় বের করে বিষপাথরে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলে কাটা জায়গায়।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকেরা বলে উঠলো, আর ভয় নেই। রোজার রাজা লালচাঁদ, ও যখন এসে গেছে আর ভয় নেই।

আমার মনও বললে, ভয় নেই।

ঝোলা থেকে এবার একটা নিমের ডাল বের করলে লালচাঁদ। তারপর দিদিমার মাথা থেকে পা অবধি সেটা বুলিয়ে বুলিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করলে।

একবার করে পাতা বোলানো শেষ হয়, আর একটু করে আশা হয়।

সমস্ত গ্রাম যেন নিশ্চুপ, থমথম করছে চারিদিক, আর তাব মধ্যে লালচাঁদ মন্ত্র পড়েঃ

তেল তেল রায়ে তেল
বিষ উঠো লাগ উঠো
বিষহরি জগৎগৌরী
লাগ বাঁধো, বিষ বাঁধো⋯ ⋯

এমনি একটা মন্ত্র পড়ে যায় লালচাঁদ, মাঝে মাঝে জরিবুটি বদলে দেয়। আর ক্রমাগত দিদিমার মাথা থেকে পা অবধি নিমের ডালটা বুলিয়ে বুলিয়ে বিষ নামাচ্ছে। কোদালের কোপে কোপে পুকুরের পাঁক তোলার চেয়েও বেশী পরিশ্রম যেন।

লালচাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দরদর করে ঘামছে লালচাঁদ, আর ক্রমশই যেন পাগলের মতো হয়ে উঠছে। গলার স্বর উঠছে ক্রমে ক্রমে, নিস্তব্ধ বাড়িটা যেন কেঁপে উঠছে থেকে থেকে লালচাঁদের কর্কশ গলার মন্ত্রধ্বনিতে।

এমন সময় ছোটমামা ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন। সদরে গিয়েছিলেন ধানকল থেকে ধানবেচা টাকা আনতে। মাঝপথে খবর পেয়েই ফিরে এসেছেন।

ফিরে এসেই দিদিমার কাছে ছুটে চললেন, কিন্তু তার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ছোটমামা। কে যেন ছুটে গেলো জল আর পাখা নিয়ে আসতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলো ছোটমামার।

শুধু হতাশ চোখে দিদিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাকে সদরের ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলে না কেন তোমরা ?

লালচাঁদের কানে গেলো কথাটা। বললে, বুলবেন না উ কথা, বলবেন না ছোটকত্তা, মা বিষহরি পাপ লিবে। বলে আবার মন্ত্র পড়তে শুরু করলে।

দুপুর বিকেল হলো, বিকেল সন্ধ্যা।

শেষে একসময় বোঝা গেলো, লালচাঁদের মন্ত্র মিথ্যে। লালচাঁদের বিষপাথর মিথ্যে।

পাশের গাঁয়ের ডাক্তার এসে পড়লেন। দিদিমার হাতখানা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

আমরা বুঝলাম, দিদিমা অনেক আগেই মারা গেছেন। নিস্তব্ধ বাড়িটা আশায় আশায় এতক্ষণ থমকে চুপ করে ছিলো, এবার সকলেই একসঙ্গে কেঁদে উঠলো।

আর লালচাঁদ হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলো, মা বিষহরি মিছা গো, জগৎগৌরী মিছা। লাগবন্দী মিছা, বিষ লামানোর মন্তর মিছা। সোনার পদ্ম মা ঠাকরুনেরে জিয়াইলো না গো, জিয়াইলো না।

বলে ধীরে ধীরে ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হনহন করে চলে গেলো মাঠের আল ধরে। তখনো অঝোরে জল পড়ছে লালচাঁদের দুচোখ বেয়ে।

এর পর আবার যে কোনদিন লালচাঁদের সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি! ভাবতে পারি নি আমাদের গাঁয়ে এসেই ও ডেরা বাঁধবে।

আমাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কোথাও ইস্কুল ছিলো না বলেই মামা বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। বছর তিনেক পরে আমাদের গাঁয়ে

নতুন ইস্কুল হতেই ফিরে এলাম। আর ফিরে এসে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেলো লালচাঁদের সঙ্গে।

রায়পুকুরের পাড়ের অশথ গাছটার নীচে ভাঙা মাটির বাড়িটা এতদিন নির্জন পড়েছিলো, খড়ের ছাউনি দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম কে আছে খোঁজ নিতে।

ডাকাডাকি শুনে প্রথম যে বেরিয়ে এলো তাকে প্রথমটা চিনতে পারি নি। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলাম। কান্ত বেদের মেয়ে পার্বতী, যাকে গান গাইতে দেখেছিলাম বেলাংডিহির ঝাঁপানে। শুধু বয়সটা বেড়েছে আরো, কিন্তু চেহারা ভেঙে পড়েছে।

ডাক শুনে লালচাঁদও বেরিয়ে এলো

চমকে উঠে বললাম, লালচাঁদ তুমি ?

লালচাঁদ হাসলো শুধু, জবাব দিলে না। বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারে নি। চেনবার কথাও নয়।

কিন্তু পার্বতী এখানে কেন ? লালচাঁদ কি……।

জিগ্যেস করতেই লালচাঁদ হাসলো আবার, বললে, পার্বতী রে বাপ, বেদের বেটী রোজার বউ হয়েছে।

কেন জানি না, মনটা বিষিয়ে উঠলো লালচাঁদের ওপর। হয়তো পার্বতীর মত বাচ্চা মেয়েটাকে বিয়ে করেছে বলে, হয়তো দিদিমাকে ও বাঁচাতে পারে নি বলে।

ফিরে এসে মাকে বললাম। বললাম, লালচাঁদ রোজাটা একটা জোচ্চোর। ও-ই তো দিদিমাকে মেরে ফেলেছে। রোজা না আরো কিছু, সব বুজরুকি ওর।

আমার কেমন একটা ধারনাও হয়েছিলো, লালচাঁদ জেনেশুনেই জোচ্চুরি করে বেড়ায়। টাকা রোজগারের ফন্দি। আর রাগ হতো ওই পার্বতী মেয়েটার ওপর।

মাঝে মাঝে বাড়ি বাড়ি চাল ভিক্ষে করতে আসতো পার্বতী।

একদিন মাকে বললাম, চাল দিয়ো না ওকে।

পার্বতী হেসে বললে, কেনে, চাল দিবে নাই কেনে?

বললাম, তুই ওকে, ওই জোচ্চোরটাকে বিয়ে করলি কেনে? তোদের জাতে লোক ছিল না?

পার্বতী হেসে উঠলো। হাত পা নেড়ে বলে উঠলো, বুলো না বুলো না, পেটে বিদ্যা লাই গো উদের, ভানুমতীর খেল দেখায় শুধু। কামালো লাগের মাথায় টোকা দিয়ে বলে আসল লাগ।

—আর লালচাঁদ সব জানে?

পার্বতী আবার হাসলো। বললে, উ রোজা বটেন, ওস্তাদ বটেন। আসল লাগ চিনেন উ, লাগবন্দী মন্তর জানেন। উ খড়ি গুনতে জানেন গো, বিষ লামানোর মন্তর জানেন।

শুনে হেসে উঠলাম আমি, আর পার্বতী রেগে গেলো। চাল ভিক্ষে না নিয়েই চলে গেল রাগে দপদপ করে পা ফেলে।

কিন্তু আমার বিস্ময় কাটলো না। তবে কি এই মোহে, এই অন্ধবিশ্বাসেই লালচাঁদের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে পার্বতী?

আর লালচাঁদ?, দিদিমাকে যখন বাঁচাতে পারলো না তখনও বলেছিলো, সব মন্ত্র মিথ্যে ওর। না কি তখন পালিয়ে আসার জন্যেই ওরকম অভিনয় করেছিলো?

কিন্তু না। শেষ অবধি লালচাঁদের বিশ্বাসেও হয়তো ফাটল ধরেছিলো। তাই একদিন হঠাৎ কথায় কথায় প্রশ্ন করলে, হাসপাতালের ডাকতোরবাবু লাকি বিষ লামানোর মন্তর জানে, বাপ?

বললাম হ্যাঁ, আজকাল সেই জন্যেই তো কেউ রোজা ডাকে না।

লালচাঁদ গম্ভীর হয়ে গেলো। বললে, ঠিক বলেছেন গো বাপ, রোজার মন্তর মিছা বটে, রোজার মন্তর মিছা।

শুনে ভাবলাম, তবে কি সত্যিই এতদিন বুজরুকি দেখিয়ে গেছে ও ? জোচ্চুরি করে গেছে জেনেশুনে ?

আমার এ-প্রশ্নের জবাব যে এত তাড়াতাড়ি পাবো, কে জানতো।

সারাদিন-রাত বৃষ্টির পর ভোরের দিকে বৃষ্টিটা তখন একটু থেমেছে। হঠাৎ কোটালদের কে এসে বললে, রোজার বউকে লতায় কেটেছে।

রোজার বউ পাবতীকে ? শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। অনুশোচনা হলো সেদিন তাকে গালাগালি দিয়েছিলাম বলে।

হরু কোটাল শুধু বললে, ক্যানেল হয়ে আজ্ঞে জল মিললো না, শুধু ট্যাক্সো দাও, আর পাহাড়ী সাপ লাও। সাপ ছিলো না এ গাঁয়ে আজ্ঞে।

কিন্তু ওর কথা আমার কানে গেলো না। ছুটতে ছুটতে চলে এলাম লালচাঁদের বাড়িতে ? এসে দেখি জন দশেক লোক জুটে গেছে। আর লালচাঁদ কেবল তরপাচ্ছে, বেদের বেটী রোজার বউ, সিঁদুরটুপি লাগ চিনলি না তুই ? লাগে মাছ ভাবলি তুই, আ বাপ !

একটু একটু করে শুনলাম সব। ভোর বেলায় আরা থেকে মাছ তুলতে গিয়েছিলো পার্বতী। আর ঘোলা জলে চিনতে পারে নি, মাছ ভেবে যেই ঝুরিতে তুলতে গেছে, অমনি কামড় দিয়েছে সিঁদুরটুপি সাপ।

ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছে। এসে বলছে লালচাঁদকে।

দেখলাম, পার্বতী চুপচাপ বসে আছে দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে তার আঙুল থেকে। কাপড় ভিজে যাচ্ছে।

পঞ্চা কোটালকে বললাম, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। না, বরং হাসপাতালেই নিয়ে যা।

পঞ্চা বললে, গাড়ি জুতবো রোজা? সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাবো?

বোঁকা বোকা চোখ মেলে আমাদের মুখের দিকে তাকালো লালচাঁদ। তারপর বললে, আ বাপ, উ কথা বুলেন না গো, মা বিষহরি জগৎগৌরী পাপ লিবে।

রেগে গিয়ে বললাম, অনেক তো মেরেছিস টাকা রোজগারের জন্যে, বউটাকে অন্তত বাঁচা।

শুনে হাসলো লালচাঁদ। তারপর ঝোলা থেকে জরিবুটি শিকড়বাকড় বের করতে করতে বললে, মা বিষহরির মন্তর কখুনও মিছা হয় গো বাপ, লাগবন্দী বিষ লামানোর মন্তর কখুনও মিছা হয়।

বলে, বিষপাথরে একটা শিকড় ঘষতে শুরু করলো।

[১৩৬৮]

রূপকথার মৃত্যু

শেষ পর্যন্ত তাসের দেশের চারটে আর ইংলণ্ডের একটা রাজাই টিকে থাকবে, মিশরের রাজা ফারুকের এই মন্তব্যটায় কিছু 'অতি-শয়োক্তি' রয়ে গেছে। 'অতিশয়োক্তি' কথাটার অভিধানগত অর্থ 'বাড়িয়ে বলা', এবং ফারুক যে এ-ব্যাপারে কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই; কারণ আমরা অনেকেই এখন বুঝতে পারছি যে, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে শুধু ইংলণ্ডের রাজাই (কিংবা রানী) টিকে থাকবে। ইশকাপন, হরতন, রুহিতন ও চিড়িতন এই চারটি তাসের দেশের রাজা রানীদের আয়ু যে আর বেশী নেই তা Tass-এর দেশ-গুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। দাবার ছককেও যখন ও-তল্লাটে সাম্যমন্ত্রে ঢেলে সাজা হচ্ছে তখন তাসের ঘরও যে একদিন ভেঙে পড়বে এমন সন্দেহ অকারণ নয়।

তবে কি ইংলণ্ডেই শুধু রাজা-রানী টিকে থাকবে?

মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, না, রাজা রানী চিরকাল বেঁচে থাকবে, কারণ আমাদের রূপকথা বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে রূপকথার রাজা রাজপুত্র, সুয়োরানী-দুয়োরানী।

এমনি এক দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আমার চার বছরের ছোট্ট মেয়ে বুলাকে রূপকথার গল্প শোনাতে গিয়েছিলাম। নিয়ে যেতে চেয়ে-ছিলাম সেই কুঁচবরণ কন্যে মেঘবরণ চুলের কল্পরাজ্যে—একদিন আমরা নিজেরাই যেখানকার অধিবাসী ছিলাম, ঠাকুমার ঝুলির নীল সোনালী কালিতে ছাপা যে পৃথিবীতে একদা আমরাও হারিয়ে যেতাম।

সেই : এক ছিলো রাজা, আর এক ছিলো রানী…।

—রানী ? বুলা চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো, রানী কেমন করে যায় জানো ? এমনি করে হাত তুলে ।

বলে বুলা নিজেই ঊর্ধ্ববাহু হলো।

বুঝতে না পেরে বললাম, চুপ করে শোনো। সেই রানীর হাতে হীরের কঙ্কণ, মাথায় মুকুট ।

—যাঃ, তুমি কিচ্ছু জানো না। বলে উঠলো বুলা।

আর আমি সপ্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকাতেই সে বললে, রানীর হাত তো সাদা, সাদা জামা পরে হাতে, আর নীল ফ্রক পরে·· ।

ফ্রক ? বিস্মিত হয়ে তাকাই তার দিকে। যেন ওই ছোট্ট মেয়েটাই গল্প বলছে, আর আমি শ্রোতা।

ক্রমশ উৎসাহ বাড়ে বুলার।

বলে রানী তো মোটরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে, এমনি হাত তুলে · ।

আবার ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দেখিয়ে দেয়। তারপর বলে, আর রাজা পেছনের মোটরে থাকে। কেন গো ?

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। এই যে সেদিন ইংলণ্ডেশ্বরী ঘুরে গেলেন, এক আত্মীয়ের বাড়ির বারান্দা থেকে দেখেছে বুলা। আর রাজাকেও দেখেছে। রানীর স্বামী যখন, রাজাই তো !

বুলা তখনও রাজা-রানীর গল্প বলে চলেছে। কিন্তু আমার কানে গেলো না সে সব কথা।

শুধু মনে হলো, রানী এলিজাবেথ আমাদের রূপকথাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন শৈশবের কয়েকটি মুহূর্তের অফুরন্ত আনন্দ ! একটি কল্পরাজ্য !

[১৩৬৮]

আমি একটি সাধারণ মেয়ে

আমি একটি সাধাবণ মেয়ে। সাধারণ মেয়েদের মতই সারা জীবন আমার কেটেছে শুধু স্বপ্ন দেখে। সাধারণ ঘরে আমার জন্ম। স্বাস্থ্য অটুট ছিল না কোন কালেই, দেখতে সুন্দরী ছিলাম না, 'পাত্রপাত্রী' কলমের ভাষায় মধ্যমশিক্ষিতা। তবু আমি স্বপ্ন দেখতাম সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের।

ছোট বেলায় যখন ইস্কুলে পড়তাম, কি ফুর্তিতেই না কেটে যেত দিনগুলো। মা কাছে ডেকে বসাত, যত্ন করে বিনুনি বেঁধে দিত। ইস্কুলের বাস এসে পড়লে ভাল করে খাওয়া হবে না বলে নিজেই বারবার ঘড়ি দেখত, সময় থাকতে সামনে বসিয়ে খাওয়াত, বলত, 'আর দুটি ভাত নিবি না?'

সত্যি, তখন মাকে কি ভাল যে লাগত। আবার ভাল লাগতও না। মনে হত, আমার যেন এতটুকু স্বাধীনতা নেই। একটু ময়লা জামা পরলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে? সময়ে ভাত না খেলেই কী নয়? চুলে তেল না দিলে, কিংবা চুল ভিজে থাকলে এমন কি অপরাধ?

তারপর একটু একটু করে বড় হলাম। আর আশ্চর্য, দেখলাম মায়ের ব্যবহারে কী অদ্ভুত পরিবর্তন। আগে মনে হত মার এত যত্ন যেন অসহ্য, এখন মনে হল, মা কি একটুও ভালবাসতে পারে না আমাকে! যত্ন পেতাম আগে, এখন পেলাম শুধু শাসন। কথায় কথায় মা শোনাত, আমি তার গলায় লেগে আছি। অর্থাৎ মা তখন আমাকে পার করার, পর করার কথা ভাবছে দিন রাত। পার করার পথটা খুঁজে পাচ্ছিল না বলেই সব দোষ এসে পড়ত আমার

ঘাড়ে। আমি নাকি সভ্যতা জানি না, দেখতে ভাল নই, কপাল খিয়ে আসি নি।

এই সময়ে ভাগ্যিস দাদার বিয়ে হল। বউদি এল ঘরে, রাঙা টুকটুকে চেহারা, এক গা গয়না, শরীর স্বাস্থ্য চমৎকার। সবচেয়ে বড় কথা, বউদির মিষ্টি ব্যবহার। দুদিনেই আমাকে আপন করে নিল। শুধু তাই নয়, একে একে আমার কাজগুলো কেড়ে নিতে লাগল বউদি। প্রথম প্রথম আপত্তি করতাম। কিন্তু প্রথমেই বলেছি, স্বাস্থ্য আমার তেমন ভাল ছিল না, তাই ঘর সংসারের কাজ করতে রীতিমত কষ্ট হত। তবু না করলে কে করবে, তাই করতে হত সবকিছু। রান্না থেকে পরিবেশন, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে মশারি খাটানোর কাজগুলো বউদি নিয়ে নিল, আর ক্রমে বউদি যত পুরনো হয়ে যেতে লাগল, দেখলাম, কাজ না করায় অনেক সুখ, অনেক আরাম। দু-একটা কাজ করতে হলেই মুখ বেজার করতাম।

এদিকে তখন দু-একজন করে মেয়ে দেখতে আসছে। মার এবং বউদির নির্দেশমত আমি সেজেগুজে তাদের সামনে গিয়ে বসছি, পরীক্ষা দিচ্ছি, পণাপণের পরীক্ষায় বাবা বারবার ফেল করছে আর সব দোষ এসে পড়ছে আমার ওপর।

কাজ আমি এমনিতেই করতাম না, যদি বা দু-একটা করতে যেতাম, মা বাধা দিত। উনোনের তাতে দিনের পর দিন রান্না করে, ঘর-সংসারের খাটুনি খেটে বউদির চেহারা দিনকের দিন কালি হয়ে যাচ্ছিল, চোখের সামনে দেখতে পেতাম। তাই কোন কোনদিন রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতাম, কাপ-ডিশ ধুতে যেতাম, আর মা বকুনি দিত বউদিকে। যেন বউদিই জোর করে খাটাচ্ছে আমাকে। এমনিতেই মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না কারও, এরপর আগুন-তাতে গেলে যা চেহারা হবে, বুঝি বা মেয়ের আর বিয়েই দিতে পারবে না। আমি কিছু বলতে পারতাম না,

কারণ ধমকটা যদিও বউদির উদ্দেশে, তবু তার মধ্যে আমার বিরুদ্ধেও একটা হুল উঁচিয়ে থাকত কথাটায়।

আমি দেখতে সুন্দরী নই, আমার কপাল মন্দ, ভব্যতা শিখি নি —এ সব অভিযোগ একদিন কিন্তু মিথ্যে হয়ে গেল। সব দুঃখ-কষ্ট, সব জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করেও সাধারণ মেয়েদের মতই যে সাধারণ স্বপ্নটা আমি দেখতাম তা একদিন সত্যি হল। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মার ব্যবহারে আবার পরিবর্তন দেখলাম। সেই ছোটবেলাকার মত আদর যত্ন করে মা সামনে বসিয়ে চুল বেঁধে দেয়, শোবার সময় নিজে হাতে করে দুধের বাটি নিয়ে আসে, খাওয়ার সময় মাছের টুকরো একটার জায়গায় দুটো হয়। এত ভালবাসা পেয়ে এক একদিন আমার চোখে জল আসত। ভাবতাম, কি বোকা আমি, এত ভালবাসে মা, আর মাকে আমি এতদিন দু চোখে দেখতেই পারতাম না।

বাবার হাতে যেদিন চাল আর টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করার কথা বলতে হল সেদিন আরও বেশী করে টের পেলাম—বাবা মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। যার স্বপ্ন দেখে এসেছি এতদিন, সেও আমার কেউ নয়। কি বোকা আমরা সাধারণ মেয়েরা। শ্বশুর বাড়ি এসে প্রথম প্রথম মন খারাপ হত বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সবই প্রায় ভুলতে বসলাম। ভাল লেগে গেল নতুন ঘর-সংসার, ভালবেসে ফেললাম শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-জা, ভাশুর, দেওর সকলকে। মনে হল, আমার মত সুখী ত্রিভুবনে কেউ নেই।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম যেদিন, তন্ময়তাটা কেটে গেল। বড় জা বললে, আমার নাকি লাজলজ্জা নেই। ননদ বললে, আমি নাকি কাজ করতে চাই না। ঠিক এত স্পষ্ট করে কেউই বলল না, হাবে ভাবে টীকাটিপ্পনী, ব্যঙ্গবিদ্রূপে এ-কথাটাই তারা বলতে চাইলে।

হঠাৎ সন্দেহ হল, ঠিক এমনি কথা যেন আমিও বলেছি বউদিকে—হাবেভাবেই বলেছি।

আমি তাই উঠে পড়ে লাগলাম ওদের খুশি করার জন্যে। একে একে সবকাজ আমি কেড়ে নেবার চেষ্টা করলাম। প্রথম প্রথম ওরা ছাড়তে রাজী হত না, অথচ কথা শোনাত। কিন্তু টানা পোড়েন চলতে চলতে একদিন আবিষ্কার করলাম উনোনের সামনে আগুন-তাতে বসে রান্না করা থেকে রাত্রে মশারি টাঙানো পর্যন্ত সবকিছুই আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। অথচ আমার খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর নেই কারও। এক পো দুধ কেউ হাত তুলে দেয় না।

ছোট ননদের তখন বিয়ের কথা চলছে। তাই শাশুড়ী তাকে কোন কাজে হাত দিতে দিতেন না। বড়-জা গেলেন বাপের বাড়ি তার ছোট ছেলের জন্যে একটি ভাই কিংবা বোন আনতে। বড় ননদ ফিরে এলেন শ্বশুর বাড়ি থেকে। বাপের বাড়িতে দু-দশদিন জিরিয়ে নেবার জন্যে। শাশুড়ী তাদের জন্যে দুধের বরাদ্দ করলেন, নিজে বসে খাওয়া দাওয়া তদারক করতেন।

আমি একা মানুষ, এতবড় সংসারটা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়েই ক্ষান্ত নই, কথায় কথায় খোঁটাও খাই, বাপের বাড়ির শীতের তত্ত্ব কেন ভাল হয় নি; মাছ-ঝালটায় নুন কেন বেশী হল, দুধ কেন ঢাকা দিয়ে রাখি নি।

শরীর খারাপ হচ্ছিল, মন আরও খারাপ হতে শুরু হল। ফলে আয়নায় একদিন দেখলাম, বিশ্রী রোগা হয়ে গেছি, চোখ বসে গেছে, রঙও আমার এতটা কালো ছিল না ত। কিন্তু কি বোকা আমি, পাছে এই চেহারা স্বামী দেখতে পায়, তাই পাউডার মেখে, সেজেগুজে এমন একটা ভাব করতাম যেন আমি যা ছিলাম তাই আছি। দু-একজন বেড়াতে এসে বলত, এ কী, তোমার চেহারা এত

খারাপ হয়ে গেছে কেন? আমি হাসতাম, কিন্তু মনের ভিতরটা গুমরে উঠত। ভাবতাম, কথাটা আমাকে না বলে শাশুড়ীকে বলে না কেন। তা হলে হয়ত ···।

দাদা একবার দেখা করতে এসে ওই কথাই বলল, তারপর বাবাও এল একদিন। এসে শাশুড়ীকে বলল, আপনাদের অমত না থাকে ত ওকে একবার নিয়ে যাই, অনেক দিন যায় নি!

শাশুড়ী অমত করলেন না। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে চিবুকে হাত ঠেকালেন।

বাপের বাড়িতে ফিরে এসে স্বস্তি পেলাম। হাত পা ছড়িয়ে এবার একটু জিরিয়ে নিতে হবে। রুগ্ন শরীরকে এবার একটু সুস্থ করে তুলতে হবে।

প্রথম কয়েকদিন বউদিরও খুব ফুর্তি। এতদিন পরে আবার দুজনে গল্পগুজব করতে পেয়েছি। আমি একদিন বউদিকে সিনেমা দেখালাম, বউদি একদিন আমাকে দেখাল। বেশ হইচই করে কেটে গেল কয়েকটা দিন।

তারপর ক্রমে ক্রমে বউদির মুখের ভাব বদলাতে শুরু করল। বেচারীর দোষ কী। অমন সুন্দর রূপ একেবারে কালি হয়ে গেছে। খাটছে ত খাটছেই সারাদিন।

একটু একটু সাহায্য করার ইচ্ছে যে আর না হত তা নয়। কিন্তু তা হলে আমার শরীর সারবে কী করে। শখ করে ত বাপের বাড়িতে আসি নি। একটু বিশ্রাম না নিলে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে আবার কাঁধে জোয়াল তুলে নেব কী করে? বউদি কিন্তু এটুকু কিছুতেই বুঝতে চাইত না। ওর গোমরা মুখ দেখে আমি বেশ বুঝতে পারতাম। মা আমার পাতে দুটো মাছ দিত কি সাধ করে! না দুধের বাটিটা এগিয়ে দিত মিছেমিছি! আমি ত দুদিনের জন্যে এসেছি, দুধ মাছ যত খুশি বউদি ত এর পর খেতে

পাবে। আমাকে এ-সব কে দেবে শ্বশুর বাড়িতে? কে দেবে বিশ্রাম?

সত্যি, বউদি এত ভাল ছিল, এখন কী যেন হয়ে গেছে। বউদির বিরক্তিটা স্পষ্টই যেন দেখতে পেতাম। তাই একদিন অতিষ্ঠ হয়ে চিঠি লিখলাম স্বামীকে।

দিন কয়েক পরেই শ্বশুর বাড়িতে চলে এলাম আমি। আবার ঘরসংসারের ভার কাঁধে তুলে নিলাম।

ভাবনা-চিন্তার সময় কই? আমি হলাম একটি সাধারণ মেয়ে। সাধারণ ঘরে আমার জন্ম, সাধারণ স্বপ্ন, হতাশাও সাধারণ। এত সময় নেই যে ভেবে দেখব--বাপের বাড়িতে যা করে এসেছি, শ্বশুরবাড়িতে তাই ফিরে পাচ্ছি। কিন্তু যদি ভেবে দেখতাম! ভেবে দেখব কি করে, তখন যে আমি সাধারণ মেয়েদের মতই আর-একটি সাধারণ স্বপ্ন দেখছি! যা সবাই দেখে।

[১৩৬৬]

রক্তবীজ

নীলিমা মনে মনে ভেবেছিল চাকরিটা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এর আগেও দুচার দিন এসে দেখা করে গিয়েছিল ও ছোট সাহেবের সঙ্গে, আভাসে ইঙ্গিতে এটুকু স্পষ্ট করেই জানিয়েছিল মিস্টার ব্যানার্জি যে, ভ্যাকান্সি যদি হয় আর নীলিমা যদি ইণ্টারভিউ পায় তা হলে চাকরিটা তারই জন্যে তোলা থাকবে। এমন কি, এর আগের সপ্তাহে যখন নীলিমা রুটিন মাফিক মনে পড়াতে এসেছিল, তখনও ব্যানার্জি বলেছিল, বেশি দেরি নেই আর, বড় সাহেব মিস্টার গাঙ্গুলী স্বয়ং চেষ্টা করছেন একটা ভ্যাকান্সি তৈরী করবার জন্যে।

কিন্তু কোত্থেকে কি হয়ে গেল! পাঁচ মিনিট আগেও নীলিমা ভাবতে পারে নি, যে-চাকরির জন্য মাসের পর মাস রোদে পুড়ে জলে ভিজে এর-ওর-তার তাঁবেদারি করে বেরিয়েছে ও, কাউকে ঠাণ্ডা কথায়, কাউকে মিষ্টি হাসিতে আর কখনও বা অনুনয়ে আব্দারে মন ভুলিয়ে যে চাকরি পাবার স্বপ্ন দেখেছে ও এতদিন, তারই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা ও এমনভাবে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দেবে!

যথারীতি সাজগোজ করে কাঁধে ফুটফুটে সাদা চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে ও যখন বড় সাহেব মিস্টার গাঙ্গুলীকে নমস্কার করল, তখন এতটুকু হাত কাঁপে নি ওর, কার্পেট-বিছানো মেঝে পার হয়ে বড় সাহেবের টেবিল অবধি হেঁটে যেতে পা টলে নি একবারও—বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও, 'বসতে পারি?' জিগ্যেস করেছিল মোলায়েম গলায়, আর গাঙ্গুলী সাহেবের "নিশ্চয়, নিশ্চয়, বসুন আপনি বসুন, মাফ করবেন, কাজের তাড়ায় ভুলেই

গিয়েছিলাম”—এ ধরনের উচ্ছ্বাসমুখর ভদ্রতায় ও একটুও বিগলিত না হয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল।

তারপর গাঙ্গুলী সাহেব জিগ্যেস করেছিলেন, তা হলে কবে থেকে আপনি জয়েন করতে পারবেন?

নীলিমা হেসে বলেছিল, যদি বলেন তো আজ থেকেই।

—না, না। আপনাকে তৈরি হয়ে নেবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে তো। আপনি বরং নেক্সট উইক থেকে···।

—বেশ তো, তাই আসব। নীলিমা খুশিমুখেই জানিয়েছিল।

—কিন্তু আপনার টার্মস্‌গুলো বোধ হয় ঠিক জানেন না। মানে পোস্টটা আমাকে হেড আপিসে' লিখে নতুন করে ক্রিয়েট করতে হল কিনা, তাই এখন মাইনেটা একটু কম।

নীলিমা বিনীত হবার চেষ্টা করছিল—অভাবের সংসারে তবু ত কিছুটা কষ্ট কমাতে পারব, মাইনে যা হোক।

গাঙ্গুলী তা সত্ত্বেও মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, না, মানে এখন অবিশ্যি পঁচাত্তর টাকা দিচ্ছে, তবে দু-এক মাসের মধ্যেই যাতে অন্তত একশো হয় তার চেষ্টা আমি করব। তা ছাড়া আপনার দাদা আমার বন্ধু ছিলেন, তিনি আজ নেই বলেই ত আর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় নি।

—তার পরিচয় তো আপনি দিয়েছেন। এত ঘোরাঘুরি করে ত দেখলাম, আজকের দিনে চাকরি দেয়া সহজ নয়। আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন।

কথা কেড়ে নিয়ে গাঙ্গুলী বলেছিল, সেই কথাই বলছি। এখন এই মাইনেতে ঢুকলে দু-মাসের মধ্যেই একটা লিফ্‌ট হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া আমেরিকান কোম্পানীর আপিস, খেয়াল-খুশি মাফিক মাইনে বাড়ায় ওরা!

—আমার এখন পঁচাত্তর টাকা হলেই যথেষ্ট, না বাড়ালেও

ক্ষতি নেই। গাঙ্গুলীকে এত বেশি লজ্জিত হতে দেখে নীলিমা বলতে বাধ্য হয়েছিল।

আর গাঙ্গুলী অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নীলিমার হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা আর পোস্টে পাঠিয়ে কি হবে, ডাকের গোলমালে হারিয়ে যেতে পারে। তা হলে নেক্সট উইক থেকেই। কেমন?

কাগজটা হাতে নিয়ে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়েছিল নীলিমা।
—আচ্ছা নমস্কার। আসি তবে।

—হ্যাঁ। নেক্সট উইক থেকে। সোমবারেই জয়েন করছেন তা হলে? বেশ। তারপর গাঙ্গুলীও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, পঁচাত্তর থেকে একশো করে দেব বলছি, পাঁচশোও হয়ে যেতে পারে, কি বলেন? বলে হেসে উঠেছিল।

বিস্মিত সস্মিত চোখে ফিরে তাকিয়েছিল নীলিমা।

—বুঝলেন না? যেমন ব্যাপার-স্যাপার দেখছি, আরেকটা যুদ্ধ ত লাগল বলে, এবার যুদ্ধটা লাগলেই দেখবেন আমাদের সকলেরই বরাত খুলে যাবে। আমেরিকান কোম্পানী, বুঝলেন না, পঁচাত্তর থেকে পাঁচশো হয়ে যাবে দুদিনে। হোহো করে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে গাঙ্গুলী, আর পরমুহূর্তেই নীলিমার চোখে চোখ পড়তেই হাসি মিলিয়ে যায় তার মুখ থেকে।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে কিছুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নীলিমা, আর ক্রমশ ওর চোখের তারায় যেন একরাশ বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ ধীরে ধীরে এসে জমা হয়। পিছনে পিছনে, ওর চোখের নরম পাপড়ির আড়ালে আড়ালে দু-ফোঁটা অশ্রুও হয়ত!

একদৃষ্টে বহুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে নীলিমা, তারপর খুব ধীর-সুস্থির হাতে আস্তে আস্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা একবার ভাঁজ করে, ছিঁড়ে ফেলে, আবার ভাঁজ করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, মাফ করবেন আমাকে, এ চাকরি আমি নিতে পারব না। বলেই দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে পড়ে! যুদ্ধ, যুদ্ধ—একটা শব্দ—বারবার ওর কানের চার পাশে ঘুরে বেড়ায়। যা ভুলে যেতে চায়, বা মুছে ফেলতে চায়, বারবার তারই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আশ্চর্য ?

স্বামী ওষুধ পাবে না, পথ্যি পাবে না। মণ্টুর ছ-বছর বয়েস হল, এখনও ইস্কুলে ভর্তি করা গেল না। রুনির জন্যে নতুন একটা ফ্রক কেনা দরকার, উপায় নেই। দেওর হয়ত ফি দিতে পারবে না পরীক্ষার, আর ধার-ধোর করে ফি যদি বা জোটে ত সাত মাসের কলেজের বাকি মাইনেটা মেটাতে পারবে না। তা হোক।

চাকরিটা না নিয়ে ও ভালই করেছে, ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল নীলিমা। বাসাই বটে। ট্রাম-লাইন থেকে পুরো পঁচিশ মিনিট ধরে এ-গলি-ও-গলি করে উনবিংশ শতাব্দীর স্মৃতিমুখর একটি বিরাট পুরনো পচা ধসা প্রাসাদের দেওয়ালে কাঁধ ঘষে ঘষে সরু একটা জলো গলি পার হয়ে ঘুঁটে-গোবরে নোংরা দুর্গন্ধ সহ্য করে দুটো পরিবারের অন্দর ডিঙিয়ে তবে ওদের ছোট্ট বাসা। এর চেয়ে বস্তির ঘরও হয়ত ভাল ছিল। ভাড়াও হয়ত কম হত। কিন্তু যে পথেই পা ফেলতে গেছে নীলিমা, সেখানেই একটা বড় হরফের 'কিন্তু' এসে নাক ঢুকিয়েছে। সত্যি, উপকার পাবার মত, সাহায্য পাবার মত লোক আজ খুব কমই আছে নীলিমার, তবু এখনও ত পুরনো দিনের অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, আত্মীয় স্বজনদের কেউ এখনও ত হঠাৎ এসে হাজির হয়, খোঁজ খবর নেয়। তাই বস্তিতে উঠে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেনা নীলিমা। তার চেয়ে…।

জুতো-জোড়া খুলে সযত্নে কাগজের বাক্সটায় ভরে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলে নীলিমা, ব্যাগটা ভরলে ভাঙা ট্রাঙ্কের ভেতর, শাড়ি আর ব্লাউজ বদলে, সে দুটো ভাঁজ করে বিছানার বালিশের তলায় রাখলে—তিন মাস আগের ইস্ত্রির পালিশটা যাতে নষ্ট না হয়। ইতিমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে দু-একবার দৃষ্টি-বিনিময় হল নীলিমার, রুগ্ন অসহায় দুটো চোখ কি একটা প্রশ্ন করতে যেন ভয় পাচ্ছে।

—নাঃ, হল না। ওরা অন্য লোক নিয়েছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে স্বামীর পায়ের কাছে এসে বসল নীলিমা।

মৃন্ময় ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে আরও ম্লান হয়ে গেল। বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল, পারল না। পায়ের কাছ থেকে এগিয়ে এল নীলিমা, মৃন্ময়ের মাথায় হাত রাখলে। সত্যি, এ রোগ-পাণ্ডুর ব্যথা-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কত দিন কাটাতে হবে ওকে! ক্রমশই যে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে মৃন্ময়! যাবেই ত। তিনমাস হয়ে গেল, আর ত এক্স-রে নেয়া হল না, ডাকা হল না ডাক্তারকে। ডাক্তারকে খবর দিলে সে আসত ঠিকই, ফি চাওয়া দূরের কথা, নিজের থেকেই বলত টাকা দিতে হবে না। কিন্তু সে ত মৃন্ময়কে বাঁচাবার জন্যে আসত না, আসত মৃন্ময়ের আয়ু কমিয়ে দেবার জন্যে। অন্য ডাক্তার ডাকার কথাও ভেবেছে নীলিমা, ফিয়ের টাকাও যোগাড় করেছে, কিন্তু—কিন্তু ডাক্তার আর এক্স-রে ত রোগ সারাতে পারে না? রোগ সারাবার ওষুধের দাম কোথায় পাবে ও, এ রোগের পথ্যিই বা জুটবে কোত্থেকে?

মৃন্ময় অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে হঠাৎ বললে, সানুর ত এমনিই পরীক্ষা দেয়া হবে না, ও-ই একটা চাকরির চেষ্টা করুক না?

নীলিমা হাসল।—ঠাকুরপো চাকরি করবে? পনেরো বছরের একটা ছেলেকে কে চাকরি দেবে? আর আমিই যখন পাচ্ছি না, ও পাবে কি করে?

পাশের ঘরে পড়ছিল সানু, ওদের কথা শুনে বই বন্ধ করেছিল। এবার উঠে এল সে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নীলিমা হেসে হালকা হবার চেষ্টা করলে।—কি ঠাকুরপো! পরীক্ষার ফি? মন দিয়ে পড় ভাই, সময়ে ঠিক যোগাড় করে দোব।

—না বউদি, পরীক্ষা এবার আর দোব না। দিলে ফেল করব। তার চেয়ে টাকাটা নষ্ট না করে আমি বরং একটা ট্যুইশনি নি। বিজন বলছিল, ওর এক ভাই ক্লাস থ্রিতে পড়ে···।

নীলিমা ধমক দেয়, খুব হয়েছে, তুমি এখন পড়তে যাও ত। পরীক্ষা দিয়ে যা করতে হয় করো।

সানু মাথা হেঁট করে সরে যায়, আবার বই নিয়ে বসে।

মৃন্ময় বলে, ও বেচারীকে বকলে কেন? সত্যিই ত, ও যদি কিছু রোজকার করতে পারে।

—হ্যাঁ, রোজকার করবে ঠাকুরপো! আজ দশটা টাকা পেলেই সব সমস্যা মিটবে, নয়? তারপর? ওর ভবিষ্যৎটা ভাবছ না কেন? আর, আর আমরাও তো ওর মুখ চেয়েই আছি। ভবিষ্যতে ও-ই হয়ত আমাদের সুদিন আনবে।

—ভবিষ্যৎ! বিষণ্ণ হাসি হাসলে মৃন্ময়।—সত্যি, ভবিষ্যৎ ছাড়া আর গতি কি, কে-ই বা চাকরি দিচ্ছে ওকে! নাঃ, আবার যুদ্ধ-টুদ্ধ না লাগলে আর···।

কথা শেষ করতে পারল না মৃন্ময়। নীলিমা চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, চুপ কর, চুপ কর তুমি।

চমকে উঠল মৃন্ময়। অর্থহীন ভাসা-ভাসা দুচোখ মেলে ব্যথাহত দৃষ্টিতে তাকাল ও নীলিমার দিকে। দেখলে নীলিমার চোখে আক্রোশের আগুন।—চুপ, চুপ কর তুমি। ও কথা কোনদিন ভুলো না—কোন দিন না। চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠল নীলিমা। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল লজ্জায় বিস্ময়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে মৃন্ময়, অসহায় শক্তিহীন দুচোখের কোণ বেয়ে অভিমানের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

লজ্জায় দুঃখে নীলিমার মুখ সাদা হয়ে গেল। ছি ছি! এ কি করল সে। কতদিন, কত বছর কেটে গেছে এই দারিদ্র্যের মধ্যে, এমনি ব্যর্থতার মধ্যে, কই কোনদিন ত ধৈর্য হারায় নি ও! এমন কি গাঙ্গুলীর কথা শুনে ও যখন এমনি আক্রোশে ফেটে পড়েছিল ভেতরে ভেতরে, তখনও ত বাইরে কোন চাঞ্চল্য, কোন অধৈর্য দেখায় নি ও। অনেক শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিল, অনেক ধীর হাতে ফেলে দিয়েছিল কাগজটা।

অথচ!

আস্তে আস্তে মৃন্ময়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে নীলিমা, মৃন্ময়ের কপালে ঠোঁট ছোয়ালে, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বললে, রাগ করলে? লক্ষ্মীটি, শোন, রাগ করো না, চোখ তোল, তাকাও তুমি। সত্যি, সারা দিন রোদে রোদে ঘুরে মাথার ঠিক্ ছিল না আমার। রাগ কর নি? বল, রাগ কর নি তুমি?

মৃন্ময় হাসল।—না, না, রাগ করি নি। ওঠ, মুখের কাছে মুখ এনো না, ছিঃ!

নীলিমা আব্দার ধরলে, না, উঠব না আমি।

—ছিঃ, সরাও, মুখ সরাও। শোন, মণ্টু রুনির কথাটা ভাব, ওদের ত বাঁচাতে হবে, ওদের…।

নীলিমা জবাব দিলে না, নিঃশব্দে মৃন্ময়ের সারা মুখের ওপর

ওর ঠাণ্ডা নরম হাতটা বুলিয়ে দিলে, চোখের জল মুছিয়ে দিলে শাড়ির আঁচলে।

ঠাকুরপো! মন্টু আর রুনি ভাত খেয়েছে? তুমি তুমি খেয়েছ ত? হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় নীলিমা জিগ্যেস করল।

সানু ঘাড় নাড়লে—আমি আর মন্টু খেয়েছি, বউদি! পোস্তর তরকারিটা যা ফার্স্ট ক্লাস হয়েছিল, মন্টু আর আমি চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছি। হাসতে হাসতে সানু বললে।

নীলিমা হাসল।—আমার জন্যে আর কিছু রাখ নি নাকি?

—ভাত আছে। পোস্তর তরকারি কিন্তু নেই। আমি কি করব, মন্টু যে খেয়ে নিল।

—বেশ করেছ। আমার ক্ষিদেও নেই। রুনি খেয়েছে, না রাগ করে বেরিয়ে গেছে?

সানু হেসে বললে, না বউদি, ও তো বাসি ভাত খায় না।

—ও! দীর্ঘশ্বাস লুকোল নীলিমা। বললে, দেখ ত ঠাকুরপো কোথায় আছে রুনি, ডেকে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণ পরেই রুনিকে টানতে টানতে নিয়ে এল সানু।

নীলিমা বললে, কি, খাবি না? আয়, খাবি আয়।

—খেয়েছি ত আমি! অভিদাদের বাড়িতে খেয়েছি আমি।

নীলিমা আহত বোধ করলে। অভিদা! সামনের তিনতলা নতুন বাড়ীটা ওদের। কিন্তু ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতেও ভয় হয় নীলিমার, ঘৃণা হয়। রুনি আর মন্টুকে কত বার তাই নিষেধ করেছে নীলিমা, বলেছে, ওরা বড়লোক, ওদের সঙ্গে ভাব রাখা তোমাদের সাজে না।

তবু রুনির মুখে অভিদা আর অভিদা। ওইটুকু বাচ্চা

মেয়ে, ও হয়ত অত-শত. বোঝে না, তফাতটা ভাবে শুধু বাড়ীর চেহারায়।

নীলিমা শান্ত স্বরে বললে, তুমি আবার ওদের বাড়ী গিয়েছিলে?

—বাঃ রে, অভিদা যে ডেকে নিয়ে গেল। মাসীমা যে খেতে দিল আমায়, তাই ত খেলাম।

—না ওদের বাড়ী যাবে না তুমি, যাবে না কোন দিন ওদের বাড়ীতে। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। ওরা আমাদের ঘেন্না করে তা জান?

রুনি চুপ করে রইল, কোন কথা বললে না। তারপর হঠাৎ নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, জান মা, অভিদা বলেছে তারাও নাকি আমাদের মত গরীব ছিল। যুদ্ধের সময় ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে।

না, নীলিমা রাগবে না আর। চটবে না কারও কথায়। কোন কথা না বলে থালায় ভাত বাড়তে শুরু করলে নীলিমা।

রুনু ডাকলে, মা!

—কি?

—অভিদা বলছিল, আবার নাকি যুদ্ধ লাগবে। তখন নাকি চেষ্টা করলে আমরাও বড়লোক হতে পারব।

চমকে চোখ তুলে তাকালে নীলিমা রুনির মুখের দিকে। না, অধৈর্য হবে না নীলিমা, আক্রোশে ফেটে পড়বে না। রুনির মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখের হাসি হাসবার চেষ্টা করলে নীলিমা; সে হাসি, হাসি নয়, হাসির বিদ্রূপ।

সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা নীলিমার সারা মন গভীর এক অবসাদ, দুঃসহ বিষাদের ভারে নুয়ে রইল। আশ্চর্য! যে কথা ভুলে যেতে চায় নীলিমা, যে অভিশপ্ত দিনগুলোকে বিস্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চায় বার বার, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই যেন সেই দৃশ্যগুলোই ওর

চোখের সামনে তুলে ধরে, ওর কানের কাছে বার বার একই কান্নার গান বাজায়। সমস্ত কাজের ফাঁকে নীলিমার উদাস ব্যথা কেবলই চমকে ওঠে।

পাশের ছোট্ট ঘরটিতে ওদের বিছানা পেড়ে দেয় নীলিমা, রুনিকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দেয়। রান্না ভাল হয়েছে কি না জিগ্যেস করে সানুকে, মণ্টুকে আদর করে ঘুম পাড়ায়, জলের গ্লাস রেখে আসে সানুর মাথার কাছে, মশারি টাঙাবার দড়িটা রুনি কোথায় নিয়ে গেছে খোঁজাখুঁজি করে। জানালার শিকে, আলনার আঁকশিতে, টেবিলের পায়ায় আর দেয়ালের পেরেকে দড়ি বেঁধে মশারি টাঙিয়ে বিছানার চতুর্দিকে ভাল করে গুঁজে দেয় ধারগুলো, তারপর গরম তেল নিয়ে এসে মৃন্ময়ের বুকে মালিশ করে দিতে দিতে কোন ফাঁকে আবার কথাগুলো ওর মনের চার পাশে ভিড় করে আসে।

কত সুখের সংসারেই না ও মানুষ হয়েছিল! ঐশ্বর্য না থাক, সে সংসারে শান্তি ছিল, সুখ ছিল।

দোতলার ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটি পরিবার। নীলিমা, নীলিমার মা-বাবা, দাদা সুধাকান্ত আর বউদি, নীলিমার ছোট একটি ভাই শুভকান্ত আর বিধবা দিদি।

ভাল চাকরি করতেন নীলিমার বাবা, বেশ সচ্ছল ভাবেই কাটছিল ওদের দিনগুলো। সংসারে ছিল শান্তি আর শৃঙ্খলা।

এমনি সময় যুদ্ধের বিষাক্ত নিশ্বাস কলকাতার বাতাস ভারি করে তুলল। এত দিন শুধু দিনে দিনে জিনিসের দাম বাড়ার মধ্যেই যুদ্ধের পরিচয় মিলছিল। আর খবরের কাগজের পাতায়, আলাপে-আলোচনায়। তবু সে যুদ্ধ ছিল অনেক দূরে, তার অভিশাপ যতখানি, আশীর্বাদও ততটাই। ধানের দাম বাড়ছিল। দেশের লোকের হাতে আসছিল টাকা। চাকুরে মানুষদের বরাতও

যেন খুলে গিয়েছিল। বেকারদের চাকরি খুঁজতে হত না, চাকরিই খুঁজে বের করত বেকারদের। আর মাসে মাসে বেড়ে চলেছিল এ-ও-তা পাঁচ রকমের এলাওয়েন্স।

হ্যাঁ, এরই ফাঁকে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বটে। দেশ-জোড়া কাঙালের ভিড় ভেঙে পড়েছিল শহর কলকাতার বুকে। কিন্তু নীলিমার দাদা তর্ক করেছে, বাবাও বলতেন, দুর্ভিক্ষ না কি যুদ্ধের জন্যে নয়। দুর্ভিক্ষ ভগবানের মার, কেউ রুখতে পারে না, বাবার কাছে বহুবার শুনেছে নীলিমা। আর দাদা বলেছে, দেশের লোকের বোকামিই নাকি দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী।

উঃ! সে সব দিনের কথা মনে পড়লেও ভয়ে শিউরে ওঠে নীলিমা। ফুটপাথে সারি সারি মড়া আর আধ-মরাদের রাশি, ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না নোংরা পচা খাবারের দুর্গন্ধে, ডাস্টবিন ঘিরে কুকুরের দলের মত কামড়া-কামড়ি, লঙরখানার সামনে দেড় মাইল লম্বা কালো কালো কঙ্কালের লাইন, আর—আর সকাল থেকে মাঝরাত্রি অবধি বাড়ীর আনাচে-কানাচে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মরদের 'ফ্যান দে মা' চিৎকারের বিরক্তি।

প্রথম প্রথম নীলিমাও বিরক্ত হত। মনে হত ওই বুভুক্ষু মানুষগুলোই বুঝি বা সব শান্তি, সব স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

তার পর মানুষগুলো মরে ভূত হয়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া সরিয়ে দিল শহরের বুক থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ছায়া নয়, সশব্দে বিষ-নিশ্বাস শোনা গেল পথে পথে।

অতিকায় হিংস্র জন্তুর মত বিরাট ট্রাক, লরী, ট্যাঙ্ক, এমফিবিয়া পিচের রাস্তা গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিল। কি ভয়ঙ্কর তার গর্জন, দম্ভিল চাকায় তার কি ভীষণ অট্টহাস!

নীলিমার মনে আছে। একদিন গভীর রাত্রিতে ঘুম-না-মানা চোখে জানালার গরাদ ধরে পথের দিকে তাকিয়েছিল নীলিমা।

আর ওর চোখের সামনে দিয়ে সৈন্যবোঝাই ট্রাকের পর ট্রাক, ট্যাঙ্কের পর ট্যাঙ্ক স্তব্ধ স্তম্ভিত পৃথিবীর বুক বেয়ে সশব্দে গড়িয়ে গিয়েছিল। ব্ল্যাক আউটের রাত্রে যুদ্ধযানের সারিকে আসুরিক ছায়ার স্রোত মনে হয়েছিল। আর কি ভীষণ শব্দ তার, শান্ত নিস্তব্ধ রাতের বুকে কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর উন্মত্ত হুঙ্কার যেন! যেন বেদনায় গুমরে-ওঠা পৃথিবীর মর্মকান্নার গোঙানি!

কত ভয়ে ভয়ে, আশঙ্কায় উত্তেজনায় পথ চলতে হত সেদিন। কপাটের এক পা বাইরে যেতেও বুক দুলে উঠত নীলিমার। মার্কিন আর ব্রিটিশ শ্বেতসৈনিকদের পৈশাচিক উল্লাস, আর পিশাচকায় নিগ্রো সৈনিকের অশ্লীল অট্টহাস!

তারপর। বিদ্রূপের হাসি হাসে নীলিমা আজও, তার পরের ঘটনার কথা মনে পড়লেই। কিন্তু না, সুধাকান্তকে দাদাকে ক্ষমা করেছে নীলিমা। দোষ দেয় না আজ তাকে। সত্যিই ত নিজের নিজের অন্তর দিয়েই ত মানুষ অপরকে বিচার করে।

প্রতিদিন দাদার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনত নীলিমা। যুদ্ধেরই নয় যোদ্ধারও। আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর স্টিফেন হিউজেস — দুজন মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুধাকান্তর। আর খাস আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার গর্বে মাটিতে পা পড়ত না সুধাকান্তর। কখনও আমেরিকার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রসংসা, কখনও বা ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেসের ঘরের খবর।

নীলিমা, নীলিমার বউদি, আর বিধবা দিদি অণিমা সকলেই হাসাহাসি করত সুধাকান্তকে নিয়ে। পেছনে পকেট-লাগানো গ্যাবার্ডিন না কি যেন, তারই প্যান্ট পরতে শুরু করছে তখন সুধাকান্ত। হাঁটা-চলায় হাবে-ভাবে পুরোদস্তুর আমেরিকান হবার বাসনা যেন। আর দাঁতে চিবিয়ে নাকিসুরে কথায় কথায় ইংরেজী বলা সে কি ধুম! এ নিয়ে কতবার যে ওরা হাসাহাসি করেছে!

বউদি ঠাট্টা করে বলত, আমার বরাত মন্দ ঠাকুরঝি। দাদাটিকে তোমার ধরে রাখতে পারলুম না। অমন মার্কিনের পাশে কি আর আমার মত লংক্লথকে মানায়, জর্জেট চাই।

দিদি অনেক ছোট বয়সে বিধবা হলে কি হবে, বেশ আমুদে, মুখে সব সময়েই হাসিহাসি ভাব, কথায় রসিকতা। সে বলত, তা মন্দ হয় না ভাই বউদি, দাদার একটা বিলিতী বউ এলে তবু মনের সুখে ইংরেজী বলতে পাব দুটো। বাংলা বলতে বড় কষ্ট হয় আমাদের, কত ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়।

নীলিমা যোগ দিত এ রসিকতায়; বলত, সত্যি দিদি, কি মজা বল ত আমেরিকানদের, নাকিসুরে কথা বললেই ইংরেজী হয়ে বেরোয় কথাগুলো। ওরা এই সব বলাবলি করত, আর হেসে লুটিয়ে পড়ত এ ওর গায়ে।

সুধাকান্ত কিন্তু চটে যেত ওদের রসিকতায়, বলত, এই জন্যেই ত এ দেশের কিছু হল না। কারও ভাল দেখবার চোখ নেই আমাদের। জানিস আমেরিকার কুলি-মজুরেরা কত রোজগার করে? বিড়লার সমান।

কখনও বলত, আমেরিকা? স্বপ্নের দেশ, সোনার দেশ! ওখানে একটা লোকও বেকার নেই, কেউ হাজার টাকার নীচে মাইনে পায় না। কত পয়সা ওদের, বিজ্‌নেসে অমন মাথা আর কারও নেই।

অণিমা হাসল।—তা ঠিক বলেছিস দাদা, ওই যে এগারো টাকা দিয়ে সিগারেট লাইটারটা কিনলে, তিন দিন গেল না। অমন জোচ্চুরির মাথা অন্য জাতের সত্যি নেই।

সুধাকান্ত রেগে যেত।—যা জানিস না তা নিয়ে মাথা ঘামাস না, ওরা তিনদিনের বেশি কোন জিনিস ব্যবহার করে নাকি? সিনেমায় দেখবি, ওরা কাগজের গ্লাসে জল খায়, আর জল খেয়েই গ্লাসটা ফেলে দেয়।

নীলিমার বউদি হেসে গড়িয়ে পড়ত এ কথায়। বলত, দেখ না, ওর বিয়ের সময় যে মাটির গ্লাসে লোকজন খাওয়ানো হয়েছিল, সেগুলো তুলে রেখেছে নীলা ঠাকুরঝির নিজের বিয়ের জন্যে।

ঠাট্টা বুঝতে পেরে চুপ করে যেত সুধাকান্ত। বলত, যা-ই বল তোমরা, ম্যালিওনেস্কার মত লোক হয় না। কি অমায়িক, কি বিনয়ী, আমাদের দেশের প্রাণ খুলে গুণগান করতে কিন্তু আর কাউকে দেখি নি। ও অবশ্য আসলে লিথুয়ানিয়ার লোক, ওর ঠাকুর্দার বাবা পালিয়েছিল আমেরিকায়, তখন থেকেই ওরা আমেরিকান হয়ে গেছে। ওর বাড়ীর সব ফটো দেখাল আমাকে, ওর বোন নাকি এবার সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছে তাদের ক্লাবে।

নীলিমা ঠোঁট টিপে-টিপে হাসি চাপত।—তা হলে তাকেই বিয়ে কর না দাদা! বেশ মেমসাহেব বউদি হবে আমাদের।

বিরক্ত হয়ে উঠে যেত সুধাকান্ত, প্রতিজ্ঞা করত ওদের কাছে আর কোন দিন ওর আমেরিকান বন্ধুদের কথা তুলবে না।

কিন্তু না বলেও থাকতে পারত না সুধাকান্ত। কোন দিন হঠাৎ এসে বলত, জানিস অণি, হিউজেসের ফিয়াঁসে, ফিয়াঁসে মানে বাগ্‌দত্তা, ভাবী বউ আর কি, তার জন্যে ইণ্ডিয়ান গানের রেকর্ড পাঠালে হিউজেস। আমিও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা রেকর্ড উপহার পাঠালাম।

তখন না হলেও, সুধাকান্তর অনুপস্থিতিতে ওরা তিন জন হাসাহাসি করেছে।—কি ভাষা ভাই, ফিয়াঁসে! দাদা যাই বলুক, আসল মানে কি জানিস ত দিদি? প্রেম করতে গিয়ে ফেঁসে গেলেই ফিয়াঁসে হয়।

তারপর—আজ ধুতি পাঞ্জাবি আর চাদর পরে গিয়েছিলাম, ম্যালিওনেস্কা বললে, এমন কুল ড্রেস ও কোন দেশে দেখে নি।

কোন দিন—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে হিউজেসের ফিয়াঁসে লিখেছে, ইণ্ডিয়ান গানের মত সাবলাইম গান ও কখনও শোনে নি।

কখনও—ম্যালিওনেস্কা বলছিল, বাঙালী মেয়েদের মত পোশাক-পরিচ্ছদে এমন চমৎকার টেস্ট কোন জাতের নেই।

এবং শেষে একদিন—ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস একদিন আমাদের বাড়ীতে ইণ্ডিয়ান ডিশ খেতে চায়, ইনভাইট করব? বলবি মাকে? বাবা রাগ করবেন না ত?

সুধাকান্তর কাছে শুনে শুনে লোক দুটোর সম্বন্ধে ওদের ঔৎসুক্যের সীমা নেই। জানতে চায়, ওরা কি ভাবে কথাবার্তা বলে, হাব-ভাবেও বা কেমন। সত্যিই তো, কপাটের আড়াল থেকেই নয় দেখবে। যেচে নেমন্তন্ন চেয়েছে যখন না বলা কি উচিত?

মার কাছে কথা পাড়লে সুধাকান্ত।—জান মা, ম্যালিওনেস্কার গলায় একটা ফিতেতে বাঁধা লকেট আছে, ওর মায়ের ছবি। ও রোজ ঘুমোবার আগে ওর মার প্যারালিসিস সারিয়ে দেবার জন্যে যেসাসের কাছে প্রার্থনা করে।

মা বললেন, আহা বেচারী! মারও কি কষ্ট বল তো বাবা! ছেলে জীবন হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে, এদিকে মায়ের হয়ত চোখে ঘুম নেই।

মা-ই বাবাকে বললেন, আহা সুধার বন্ধু, হলই বা সাহেব। মা-বাপ, ভাই-বোন, ঘর-সংসার ছেড়ে এত দূরে যুদ্ধ করতে এসেছে, দুমুঠো ভাত খেতে চেয়েছে বন্ধুর বাড়ীতে, তাতে তোমার আপত্তি কিসের?

শেষ অবধি তাই মত দিতে হল।

আর হিউজেসের প্রথম আগমনের দিনটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে নীলিমার। বিনয়ী লাজুক-লাজুক মুখ নিয়ে ম্যালিওনেস্কার—

পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকল ও, চৌকাটে হোঁচট খেল, কোথায় বসবে কি ভাবে কথা বলবে, ভেবেই যেন সন্ত্রস্ত। নীলিমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই চটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস, হেসে বললে, আপনার ছেলে ইণ্ডিয়ান কাস্টম সব শিখিয়ে দিয়েছে আমাদের।

মা আড়াল থেকে চোখ মুছলেন, আর ওরা তিন ননদ-বউদি মুখে আঁচল চেপে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর সহজ ভাবেই আসা-যাওয়া শুরু হল ওদের। নীলিমা দেখলে গায়ের রঙ ফরসা হলেও, মুখে ইংরেজী বললেও লোকগুলো ভয় করবার মত নয়, অসুর নয়। খুব সহজ ভাবেই পরিবারের সকলের সঙ্গেই কেমন করে যেন মিশে গেল ওরা, বন্ধু হয়ে গেল। নীলিমা, নীলিমার বউদি, এমন কি বিধবা দিদি অণিমাও ওদের সামনে চায়ের বাটি এগিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করলে না।

আর লোক দুটোর চোখেও ত কই কোন দিন অভদ্র ইশারা ধরা পড়ে নি ?

আশ্চর্য !

সেদিনটার কথা ভোলে নি নীলিমা, ভুলবে না। কিন্তু—কিন্তু সেদিনের কথা মনে পড়লেই যেন ভয়ে শিউরে ওঠে ও। একবার মনে পড়লে সারা রাত ঘুম আসে না ওর চোখে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। উষ্ণ আক্রোশে জ্বালা করে ওঠে চোখের কোণ দুটো।

ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেসদের রেজিমেন্ট পরের দিন ভোরেই নাকি-বর্মার যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে চলে যাবে।

বিষণ্ণ বিষাদী মুখে ম্যালিওনেস্কা শুকনো হাসি হাসবার চেষ্টা

করলে। নীলিমাকে বললে, মিস্, হয়ত ফিরতে পারব না আর। জীবনের মেয়াদ বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে।

হিউজেসের চোখও যেন ভিজে-ভিজে মনে হয়েছিল। ও সুধাকান্তকে বলেছিল, বন্ধু, এই ক্যামেরাটা তোমাকে উপহার দিলাম, তোমার একটা ছবি আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো এক মাসের মধ্যে কোন চিঠি না পেলে। লিখে দিয়ো মৃত্যুর আগে অনেকগুলো শান্তির আর সুখের দিন হিউজেস যার সঙ্গে কাটিয়েছিল এ তারই ফটো।

মা আশীর্বাদের ইচ্ছায় হাত তুলে বললেন, ষাট, ষাট, যুদ্ধে যাচ্ছ, যুদ্ধ হয়ে গেলেই ফিরে আসবে ; আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার নিজের মা বেঁচে থাকলে যেমন-ভাবে আশীর্বাদ করত, আমি তেমনি করেই আশীর্বাদ করছি বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমরা দুজনেই তোমাদের বাঙালী মায়ের কাছে সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে।

ওদের মঙ্গল কামনায় পাঁচ সিকে পয়সা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে মা তুলে রেখেছিলেন মানত করে।

নীলিমার বিধবা দিদি অণিমা এত দিন হাসি-ঠাট্টা করেছে, কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। কিন্তু সেদিন সেই শুচিশুভ্র থান কাপড়ের বৈধব্য-বেশ সবটুকুই যেন ব্যথায় বেদনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এতটুকু হাসি দেখা দেয় নি তার মুখে ; একটা কথাও বলতে পারে নি অনেকক্ষণ। নীলিমার মনে আছে, দিদির চোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল সেদিন। কাঁপা-কাঁপা হাতে নমস্কার জানিয়েছিল, থরথর করে ঠোঁট-জোড়া কেঁপে উঠেছিল তার, কথা বলতে গিয়ে।

গাঢ় গলায় বলেছিল, তোমাদের ছোট বোন আমি, আমি বলছি, তোমাদের কোন বিপদ হবে না। সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে

যাবে তোমরা, মা কালী, রক্ষাকালী তোমাদের বাঁচাবেন। এই নাও, ভক্তি করে এই মাদুলি দুটো রেখো, তোমাদের কোন বিপদ হবে না।

ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস তখন বিদায় নিয়ে ফিরে গেল। নীলিমার স্পষ্ট মনে আছে, দুজনের চোখেই দেখেছিল লুকানো অশ্রু।

—I wish she were my own mother, they were my own sisters.

চোখ ছল-ছল করে উঠেছিল ওদের দুজনেরই, পরস্পরকে বলেছিলঃ উনি যদি আমার মা হতেন, ওরা যদি আমার নিজের বোন হত!

সে রাত্রে ঘুম আসে নি নীলিমার চোখে, বহুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার আতঙ্কে ভীতত্রস্ত দুটি জীবনের কথা বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

তারপর। তারপর মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে উপহাস করে অতিকায় জন্তুর মত বিরাট একটি ট্রাক ছায়া-ছায়া অন্ধকার ভেদ করে, শব্দের হুঙ্কার তুলে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের বাড়ীর দরজায়। আর ট্রাক-বোঝাই একরাশ সৈন্যের কালো কালো প্রেতছায়া অট্টহাসে বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। সুরামত্ত মাতালের দল; শ্বেতসৈনিক আর নিগ্রো সৈন্যের দল চিৎকার করে, অর্থহীন গানের কলি আউড়ে, হই-হল্লা করে লাফিয়ে নেমেছে ট্রাক থেকে।

হেডলাইটের ঝকমক আলোয় নীলিমা চিনতে পেরেছে। ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস কাঁধ-ধরাধরি করে টলতে টলতে এগিয়ে এসে ওদের বাড়ীর কপাট দেখিয়ে দিয়েছে দলবলকে। আর সৈন্যের দল কপাটের ওপর লাথির পর লাথি মেরেছে। কপাট ভেঙে পড়েছে সে আঘাতে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে নীলিমা, নীলিমার মা, বাবা, বউদি, দিদি—সবাই। পালাবার কথা, লুকোবার কথাও তখন ভুলে গেছে ওরা। যখন মনে হয়েছে পালানো উচিত, লুকানো উচিত, তার আগেই মদের গন্ধে সারা ঘর ভরে গেছে। প্রেতের মত অগুন্তি ছায়া-শরীর ওদের ঘিরে ফেলেছে তখন। বাবা আর দাদা ছুটে গেছে বাধা দেবার জন্যে। ওই দানব-শরীরের কাছে ওরা আর কতটুকু? বন্দুকের বাঁটের একটা ঘা কে যেন বসিয়ে দিয়েছে দাদার মাথায়, অজ্ঞান হয়ে ছিটকে পড়েছে দাদা। নিস্তব্ধ রাতের বুকে হঠাৎ একটা পিস্তলের গুলির শব্দ। চিৎকার করে যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন নীলিমার বাবা। ছোট ভাই শুভকান্ত কেঁদে উঠেছে সশব্দে, ভয়ে নীলিমার পা জড়িয়ে ধরেছে।

তার পর, তার পর ম্যালিওনেস্কা এগিয়ে এসেছে টলতে টলতে। নীলিমার চোখের সামনে। একটা ক্ষুধার্ত পশুর মত···।

থপ-থপ করে এগিয়ে এসেছে হিউজেস, সে কি ভীষণ ভয়াল চোখ···।

বউদির একটা কান্না চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ।

আর নীলিমা···কতক্ষণই বা ওর জ্ঞান ছিল? তবু যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, নীলিমার শুধু মনে পড়ে, একটার পর একটা প্রেতের ছায়া এগিয়ে এসে ওকে গ্রাস করেছে।

একটা পুরো দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল নীলিমা। জ্ঞান হয়ে দেখলে ডাক্তার, পাড়াপড়শীদের অনেকে ভিড় করে এসেছে। লজ্জায় চোখ বুজলে নীলিমা।

কিন্তু কত দিন আর চোখ বুজে থাকা যায়? পিস্তলের গুলীতে বাবা মারা গেলেন। মা আত্মহত্যা করলেন। বউদি অন্তঃসত্ত্বা ছিল, আঘাতের ফলে এক মাস ধরে অসুখে ভুগে মারা গেল।

বিধবা দিদি হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠল একদিন, উনুন ধরাতে গিয়ে সারা গায়ে ছাই মাখতে শুরু করলে। তার পর কোন্ ফাঁকে কপাট খোলা পেয়ে কোথায় যে চলে গেল, খোঁজ মিলল না।

সুস্থ শরীরে শুধু বেঁচে রইল নীলিমা, সুধাকান্ত আর শুভকান্ত! চুপচাপ, উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলত না সুধাকান্ত। এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যেত না। শুধু অন্যমনস্ক ভাবে বসে থাকত সদা সর্বদা। তারপর মাস দুয়েকের মধ্যে নীলিমার বিয়ের ব্যবস্থা করল সুধাকান্ত। আর বিয়ের পরদিনই খবর পাওয়া গেল একটা মিলিটারী ট্রাকে চাপা পড়ে সুধাকান্ত মারা গেছে। সে খবর শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল নীলিমা। কোন কথা বলে নি! আনন্দের আবেগ বুনে বাসর কাটায় নি ও, পর-পর এতগুলো মনভাঙা দুর্ঘটনা, এত বড় একটা ঝড় সহ্য করে কেউ সিঁথি-সিঁদুরের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারে? বিষণ্ণ ব্যথার মধ্যেই সেদিন ও নিজেকে সমর্পণ করেছিল মৃন্ময়ের কাছে, মন্ত্রপাঠের সময় মৃন্ময়ের হাতের মধ্যে ওর হাতখানা কেঁপে উঠেছিল বার বার। মৃন্ময় ভেবেছিল, ভয়। ওর চোখের বেদনাশ্রু দেখে ভেবেছিল, এ বুঝি শৈশবের স্মৃতিতে গড়া মায়ামুগ্ধ ঘর ছেড়ে অনির্দেশে পা দেয়ার ব্যথায় সজল।

মৃন্ময় জানত না।

নীলিমার চোখে জল বয়েছিল একটি আকস্মিকতার অভিশাপকে স্মরণ করে, নীলিমার ভয়-ভীরু হাত কেঁপেছিল গোপন আত্ম-গ্লানিতে, জীবনের লুকিয়ে-রাখা একটি আত্মধিক্কারের অধ্যায়কে স্মরণ করে।

তার পরের দিন রাত্রেই সঠিক খবর এল, নীলিমা যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটে গেছে। মিলিটারী ট্রাক চাপা পড়ে মারা

গেছে সুধাকান্ত। কে যেন বললে, আজ-কাল হামেশাই ত হচ্ছে, একটু দেখে-শুনে না চললেই···।

কেউ গালাগালি দিলে মিলিটারীর উদ্দেশে, বিদেশী সৈনিক-দের উদ্দেশে।

নীলিমার মন বললে অন্য কথা। দীর্ঘ কয়েকটি মাস প্রতি মুহূর্তে যে কারণে সশঙ্কিত থাকত নীলিমা, সামান্য শব্দে চমকে চমকে উঠত যে ভয়ে, একটা মিনিট সুধাকান্ত চোখের আড়াল হলে যে আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠত ওর, তাই ঘটে গেল। নীলিমা বুঝতে পারলে, কেন এই দীর্ঘদিন ধরে একটিও অতিরিক্ত কথা না বলে, লোকালয় থেকে মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে নিঃসঙ্গ নিশ্চুপ দিনগুলো কাটিয়ে এসেছে সুধাকান্ত! কেন কর্তব্য শেষ করার পর একটা সম্পূর্ণ দিনও বেঁচে থাকবার সাধ জাগল না সুধাকান্তর ?

নিজেকে অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত অপরাধী মনে হল নীলিমার। যে লজ্জায়, যে গ্লানির অসহ্য জ্বালায় সকলেই পৃথিবী থেকে পালাবার পথ খুঁজল, সেই গ্লানি, সে লজ্জা লুকিয়ে রেখে নতুন করে বাঁচবার এ কি দুঃসহ আশা তার !

তবু সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে গেল একদিন। মৃন্ময়ের আদরে সোহাগে মনে হল, আকাশে এখনও চাঁদ ওঠে, মেঘ এখনও রামধনু আঁকে নতুন নতুন। অতীতের নোংরা কপাট চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে আবার জীবন শুরু করতে চাইলে নীলিমা।

কিন্তু, যে পথেই হাঁটতে গেছে নীলিমা—একটা মস্ত বড় 'কিন্তু' এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

মৃন্ময়ের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ভরা রঙিন পাখনা থেকে শিশিরের মত তাকে ঝরে পড়তে হয়েছে এই নোংরা না-আলো না-বাতাস অন্ধ গলির দুর্গন্ধময় ছোট্ট ঘরখানিতে। অভাব, দারিদ্র্য,

রোগ-শোক। প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। অসহায় দুঃখে মৃন্ময়ের চোখে-জল-ঝরানো কষ্টসহিষ্ণুতা, ক্লান্তিতে ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে রাত জেগে জেগে মৃন্ময়ের বুকে হাত বুলিয়ে স্বস্তি দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

ব্যর্থই।

ভোর হবার অনেক আগে, অন্ধকার ফিকে হওয়ার আগেই আবার কাশির দমকে-দমকে রক্ত উঠতে শুরু হল। অসহ্য কষ্টে বুকে হাত চেপে বার কয়েক কাশে মৃন্ময়, আর তার পরই পিক-দানিতে ফিনকি দিয়ে কালো রক্ত পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলে নীলিমা। কি করবে, ও কি করা উচিত?

তারপর ধীরে ধীরে পাশের ঘরে নিদ্রিত সানুকে ডেকে বললে।

—ঠাকুরপো, ডাক্তার বাবুর কাছে যাও একবার, যেমন করে পার হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এস একবার।

দাদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত আশঙ্কায় তাকিয়ে দেখল সানু, তারপর ছুটে চলে গেল। বলে গেল, কিছু ভেবো না বউদি, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি।

মৃন্ময় শুধু বিষণ্ন চোখে তাকালে নীলিমার দিকে, ইশারায় পাশে বসতে অনুরোধ জানালে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, মিথ্যে চেষ্টা নীলিমা, আমি বুঝতে পারছি।

নীলিমা কি যেন একটা বলতে গেল, মৃন্ময় বাধা দিল। বললে শোন, একটা কথা তোমাকে বলব বলেও কোন দিন বলতে পারি নি, একটা অপরাধ আমি স্বীকার করে যেতে চাই নীলিমা।

জানি, সে অপরাধ তুমি ক্ষমা করতে পারবে না কোন দিন, তবু আমি তো শান্তি পাব।

নীলিমা বললে, চুপ কর লক্ষ্মীটি, চুপ কর তুমি। ডাক্তার বাবু এলেই তুমি সেরে উঠবে, আমি বলছি, তুমি সেরে উঠবে। এর আগেও ত কতবার এমন হয়েছে, কেন ভয় পাচ্ছ তুমি? কথা বলো না, চুপ করে থাক একটু।

মৃন্ময় হাসলে।—এর আগে ত কখনও মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাই নি নীলিমা, বুঝতে পারি নি। এবার যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নীলিমা, বলতে দাও, একটা কথা আমাকে বলতে দাও!

নীলিমা চুপ করে রইল, কোন বাধা দিল না, কোন কথা বললে না। একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইল, আর ওর দুচোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দে।

—তোমার ওপর আমি···লজ্জায় আত্মগ্লানিতে সমস্ত মুখ যেন সাদা হয়ে গেল মৃন্ময়ের, বললে, আমি যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নেই নীলিমা! আমি, আমি আমার অসুখ লুকিয়ে রেখে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।

বিস্ময়ে চমকে উঠল নীলিমা, মৃন্ময়ের মুখের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকাল।

—হ্যাঁ, নীলিমা! হঠাৎ একদিন কাশতে কাশতে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরুল থুতুর সঙ্গে। ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি, সমস্ত দিন, সমস্ত রাত মনে হল, আমি যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি। মনকে বোঝাতে চাইলাম, হয়ত গলায় ঘা, নয়ত দাঁতের গোড়া থেকে পড়েছে। পরের দিন, তার পরের দিনও রক্ত পড়ল দু ফোঁটা করে, ভোরের দিকে। খাওয়া-দাওয়া ভাল করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ডাক্তার দেখাতে সাহস পেলাম না। সত্যিই যদি

এ রোগ হয়ে থাকে, ডাক্তার হয়ত সারাতে পারে। কিন্তু অত টাকা কোথায় আমার? আর, আর সেরে যাবার পর কি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ফিরে নেবে আমাকে? কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ কি ছিল জান নীলিমা!

নীলিমা শুনছিল ওর কথা, একমনে। হয়ত সব কথা ভাল করে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ ভেঙে পড়ল মৃন্ময়ের বুকের উপর। আগে বল নি কেন, বিয়ের পরেই কেন বল নি তুমি আমাকে? তা হলে এত দেরি হত না, হয়ত সেরে উঠতে তুমি। আমি ত ছিলাম, আমি ত তোমাকে ছেড়ে যেতাম না? কেন বল নি তুমি, কেন?

মৃন্ময় হাসল। বললে, বুঝবে না নীলিমা, তুমি বুঝতে পারবে না। দিনে দিনে ওজন কমে যাচ্ছে দেখলাম, প্রতিদিন জ্বর হচ্ছে বুঝতে পারতাম। আর কেবল ভয় হত। ভাবতাম, এমনি ভাবে জীবনে কোন ভালবাসা না পেয়ে, কোন মেয়ের স্পর্শ না পেয়ে, অনুতাপ অনুভব না করে মৃত্যু হওয়ার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর নেই। তাই অসুখ গোপন রেখে তোমাকে বিয়ে করলাম, আর বিয়ের পরও তোমার সঙ্গ প্যাবার জন্যে, তোমাকে হারাবার ভয়ে কোন দিন বলতে সাহস পাই নি। আজ তোমাকে হারাবার ভয় নেই বলেই দূরে সরে থাকতে বলি, সেদিন পারতাম না।

নীলিমার চোখের জলে জামা ভিজে গেল মৃন্ময়ের। কান্নাচাপা গলায় নীলিমা বললে, ছিঃ ছিঃ, এমনি করে নিজের সর্বনাশ করে, ভেতরে ভেতরে এমনি করে রোগ বাড়িয়েছ তুমি?

মৃন্ময় হাসলে, ব্যথাহত হাসি। সেদিন রোগকে ভয় ছিল না আমার, মৃত্যুকে ভয় ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল, মৃত্যু যখন আসছেই, জীবনকে ভোগ করে নেই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!' কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়ল নীলিমার।

মৃন্ময় আবার কিছুটা সুস্থ হল, ডাক্তার মত দিল, হয়ত এ যাত্রাটা কোন রকমে কেটে যাবে। খরচ করে ভাল ভাবে চিকিৎসা করলে এখনও বাঁচান যেতে পারে মৃন্ময়কে। কিন্তু নীলিমার কানে এ সব কথা পৌঁছল না। জানালার ধারে বসে বাইরের ছোট্ট এক ফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে নীলিমা শুধু ভাবলে, 'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায়!'

মিথ্যে নয় তা হলে, অপরাধ স্খালনের মিথ্যা ভনিতা নয়! আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর স্টিফেন হিউজেস! তুজনের কথা মনে পড়ল নীলিমার? মনে পড়ল সেই চিঠির কথা।

বহু দিন আগে হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল নীলিমা ওদের সেই পুরোন ফ্ল্যাটে। নতুন বাসিন্দেদের বলেছিল, ঘুরে ঘুরে বাড়ীটা একবার দেখব, এখানে আমরা ছিলাম কিনা এক সময়।

গৃহকর্ত্রী তখন আদর-আপ্যায়ন করে বসিয়েছিলেন ওকে, এনে দিয়েছিলেন একখানা চিঠি।—এ চিঠি কি আপনাদের, অনেক দিন থেকে পড়ে আছে, বুঝতে পারি নি বলে খুলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

চিঠিটা নিয়ে চলে এসেছিল নীলিমা। দাদার চিঠি, সুধাকান্তর নাম—ঠিকানার ঘরে। কিন্তু কে লিখেছে এ চিঠি? উল্টে-পাল্টে দেখেছিল ও, যুদ্ধ-ফ্রন্টের অগুন্তি সেন্সারের ছাপ, নম্বর, তার ওপর এখানকার ডাকঘরের সীলমোহর।

চিঠিটা পড়েছিল নীলিমা। নাম সই ছিল না, কিন্তু নীলিমা বুঝতে পেরেছিল, এ চিঠি সেই তুটো অসুরের কোন একজনের

লেখা। ক্ষমা চেয়েছিল সে সুধাকান্তর কাছে, লিখেছিল, "বন্ধু, তুমি জান না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হলে মানুষ কতখানি অমানুষ হয়ে যায়। আমাকে তোমরা হয়ত শয়তান ভাব, কিন্তু আসল শয়তান এই যুদ্ধ। নিজেদের মনুষ্যত্ব আমরা এই ডেভিলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, তাই আমরাও এক-একটি ক্ষুদ্র শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে রাত্রে প্রকৃতিস্থ হবার পর, আর এই ওয়ার-ফ্রন্টেও কতবার ইচ্ছে হয়েছে সুইসাইড করে আমার অপরাধের গ্লানি মুছে ফেলি। কিন্তু পারি নি, আমি ভীতু, কাপুরুষ। জীবনকে আমি বড় বেশি করে ভালবাসি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ জীবনকে আরও বেশি করে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার মায়ের আশীর্বাদ, তোমার সেই বিধবা দিদির প্রার্থনা যদি এতদিনে অভিশাপে পরিণত হয়ে না থাকে, তা হলে হয়ত সত্যিই দেশে ফিরে যেতে পারব আমি জীবন নিয়ে। আজ রাত্রেই আমাদের জাহাজ ছাড়বে, দেশে ফিরে যাব আমরা। আত্মহত্যা করার সাহস পাই নি আমি সত্যিই, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে কোনদিন এই বড় শয়তানটাকে জাগতে দেব না আমি। ভেবে দেখো, হয়ত চেষ্টা করলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে তুমি, হয়ত পারবে না, কিন্তু যুদ্ধকে কোন দিন ক্ষমা করো না ভাই।"

এ চিঠি পড়ে সেদিন ক্রোধে-আক্রোশে সারা শরীরে জ্বালা অনুভব করেছিল নীলিমা, দাঁতে দাঁত চেপে, এমনভাবে চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিয়েছিল, যেন সেই পৈশাচিক মানুষ দুটোর শরীর ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে সে। অদ্ভুত এক আনন্দে, অসহ্য এক দুঃখে সারারাত্রি তার চোখে ঘুম আসে নি সেদিন।

তারপর, দিনে দিনে সব বেদনা, সব আক্রোশ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। মন বলেছিল—আমরাও এক একটি ক্ষুদ্র শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে!

মনে পড়ছিল—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

মৃন্ময়ের পায়ের কাছে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একমনে ভাবছিল নীলিমা, মনে পড়ছিল···।

এমন সময় হঠাৎ রুনি এসে দাঁড়াল তার সামনে। চুপচাপ, চোখে চোখ পড়তেই কি যেন বলতে গিয়ে লজ্জায় চুপ করে গেল। তারপর অনেক চেষ্টা করেই যেন বললে, মা, অভিদার বড়দা এসেছেন, বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছেন।

চমকে ধড়মড় করে উঠে পড়ল নীলিমা। দেখল অভিজিৎ, অভিজিতের দাদা, আর বৃদ্ধ, কুব্জদেহ একটি দীর্ঘ শরীরের সৌম্য-বিস্তৃত একজোড়া চোখ। মুখে বার্ধক্যের হাসি!

নীলিমার মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, ভয় কি মা, সব সেরে যাবে।

তারপর মৃন্ময়কে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে মা, এখানে ত হবে না।

নীলিমা কেঁদে ওঠে!—না, না, হাসপাতালে না।

বৃদ্ধ হাসেন ধীরে ধীরে।—এ এক যুদ্ধ মা, এর নাম জীবনযুদ্ধ! মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হলেও ত অনেক সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদ দরকার হয়। একা একা এখানে পারবে কেন?

—কিন্তু, কিন্তু অত টাকা ত আমার নেই? না, না হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে না, আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না।

বৃদ্ধ ডাক্তার আবার নীলিমার মাথায় হাত রাখেন।—তুমিই

বরং ওর কাছে চল না মা, তুমিও আমাদেরই একজন হও না? আমরা সবাই তোমার স্বামীর জন্যে যুদ্ধ করব, আর তুমিও, শুধু তোমার স্বামীর জন্যে নয়, সকলের জন্যে যুদ্ধ করবে। সেবা দিয়ে সাহস দিয়ে আরও অনেককে সারিয়ে তুলবে তুমি।

উৎসাহে আনন্দে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায় নীলিমা।—পারব, পারব আমি? আমি যে কিছু জানি না।

সস্মিত হাসিতে মুখ ভরে যায় বৃদ্ধের। বলেন, যে একা একা এত বড় যুদ্ধ চালিয়ে এল, সকলের সঙ্গে এক হয়ে সে লড়তে পারবে না? পারবে মা, পারবে।

নীলিমা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে এর পর। ওর মন বললে যুদ্ধকে আমি ভয় পাই না। যুদ্ধ চাই, অমিও যুদ্ধ চাই।

[১৩৫৮]

এক সের বেগুন

বীরভূম জেলার রায়মঙ্গল কেন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা আবুল হোসেন হায়াত সাহেব কেন মাত্র সতেরোটি ভোট পেয়ে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁর ভোট বাক্সের উপর কেন একটি হাস্যকর উপহার পাওয়া যায়, সে-রহস্য সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই উপহার সামগ্রীটির মধ্যেই তার পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

হায়াত সাহেব সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন এ-সংবাদ পাঠ করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাই স্তম্ভিত হয়েছেন, যদিও রাজনৈতিক দলবিশেষ ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হায়াত সাহেবের পরাজয় ও তাঁদের প্রার্থীর আশাতীত জয়লাভকে তাঁদের দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলে প্রচার করতে শুরু করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এ-ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, নির্বাচনে কোন প্রার্থীর জয়লাভের পিছনে রাজনৈতিক দলের কিংবা দলীয় প্রার্থীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই কার্যকরী হয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে জয়ী প্রার্থী আব্দুল করিম সাহেবের জনপ্রিয়তাকে ইতিপূর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছিল এবং ঘোড়দৌড়ের ভাষায় যাকে আপসেট বলা চলে, তেমনই একটি নির্বাচনের প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য এবং এই নির্বাচনী ফলাফলকে নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এই নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমি যখন স্বয়ং করিম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি কোন উল্লাস প্রকাশ করা দূরের কথা, স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, এই ফলাফলকে তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

স্মরণ থাকতে পারে, হায়াত সাহেব এ অঞ্চলের অক্লান্ত কর্মী

এবং একনিষ্ঠ সমাজসেবী হিসেবে দীর্ঘ বাইশ বছর যাবৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং গত দুটি নির্বাচনেই তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি হয়েছে বলে শোনা যায় নি, বা তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারেন নি এমন সন্দেহও করা সম্ভব নয়। কারণ বিধানসভার অধিবেশন-কালীন সময়টুকু ব্যতীত সারা বৎসরই তিনি স্বগ্রামে বসবাস করেন এবং আপন চেষ্টায় তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া বিধানসভাতেও তাঁর নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় ইস্কুলের জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, হায়াত সাহেব যে মাঝে মাঝেই স্বদলের গ্রাম-বিরোধী ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে দলীয় প্রধানদের বিরাগভাজন হয়েছেন তাও এ-অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে অজ্ঞাত নেই। তৎসত্ত্বেও কেন যে হায়াত সাহেব এ-ভাবে পরাজিত হলেন তার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি বিচিত্র সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোন কোন জননেতা এই সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, এমন কি দুই একজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এ-খবরও জানা গেছে। কিন্তু হায়াত সাহেবের মত জনপ্রিয় প্রার্থীর মাত্র সতেরোটি ভোট পাওয়ার সংবাদ বোধ করি সমগ্র নির্বাচনের ইতিহাসেই একটি দুর্বোধ্য রহস্য হিসাবে স্বীকৃত হবে।

গত পরশুর সংবাদপত্রে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবং সে ফলাফলের তালিকায় দেখা গেছে, করিম সাহেব সতেরো হাজার তিনশো বাষট্টিটি ভোট পেয়েছেন,

স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু পেয়েছেন দু হাজার একশো একান্নটি ভোট, এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও হায়াত সাহেবের বাক্সে মোট সতেরটি ভোট পড়েছে। গতকালের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং হায়াত সাহেবের পরাজয়কে অনেকে দলীয়-জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ রহস্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে এসে জানা গেল যে, হায়াত সাহেরেব বাক্সে কেলমাত্র সতেরোটি ভোটপত্রই পাওয়া যায় নি, এ-ছাড়াও আরেকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। অফিসার নাকি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কাছে গল্পচ্ছলে জানান যে, হায়াত সাহেবের বাক্সের উপরে কোন ভোটদাতা একটি বেগুন রেখে যান। উক্ত ভোটকেন্দ্রের উভয় রাজনৈতিক দলের এজেণ্টরাই এ কাহিনী সমর্থন করেন, এবং পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, কয়েকদিন পূর্বে কোন একটি পোলিং বুথে ভোটবাক্সের উপরে কেউ একটি বেগুন রেখে যায়, এ-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য সে সংবাদে কোন্ প্রার্থীর বাক্সের উপরে বেগুনটি পাওয়া যায় উল্লেখ করা হয় নি। এবং বলা বাহুল্য সে-সময়ে খবরটি পাঠ করে সকলেই কৌতুকবোধ করেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে উক্ত সংবাদটি কৌতুককর মনে হলেও ঘটনাটির পিছনে কি গভীর তাৎপর্য ও করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে তার কিছুটা হদিস বোধ হয় পাওয়া গেছে।

রায়মঙ্গল কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ষাট হাজার। তন্মধ্যে তেরো হাজার মুসলমান ও সাতচল্লিশ হাজার হিন্দু। সুতরাং কোন কোন মহলে যে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনে এবার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হয়েছে তা সত্য নয়। কারণ সাম্প্রদায়িক কারণে করিম সাহেব তেরো হাজার ভোট পেয়ে থাকলেও স্বীকার করতে হবে, অন্তত চার হাজার হিন্দু ভোটও

তিনি পেয়েছেন। অথচ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু হিন্দুদের ভোট অধিক সংখ্যায় পেতেন, এবং মুসলমানদের ভোট পেতেন হায়াত সাহেব। কারণ হায়াত সাহেবের পিতা এতদঞ্চলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মৌলবী ছিলেন এবং দরিদ্র মুসলমান চাষীদের উন্নতির জন্য হায়াত সাহেব প্রাণপাত করেছেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। অন্য পক্ষে করিম সাহেব বিঞ্চিৎ সাহেবী ভাবাপন্ন, দরিদ্র মুসলমান চাষীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগই তিনি রাখতে পারেন নি, কারণ ব্যারিস্টারী পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকতে হয়। সুতরাং এই বিস্ময়কর ঘটনাটির জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে অকারণে দায়ী করা চলে না।

আরেকটি মহলের গবেষণায় প্রকাশ, জমিদারি উচ্ছেদের পক্ষে হায়াত সাহেব যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন, তার ফলেই নাকি তিনি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারগুলির ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং করিম সাহেব প্রাক্-নির্বাচন সফরে ক্যানাল ট্যাক্সের বিরোধিতা করে যে-সব বক্তৃতা দেন, তা গ্রামবাসীদের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু সংবাদ নিয়ে এবং সেটেলমেণ্ট আপিসের নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের মাত্র সাতশো পরিবার জমিদারি উচ্ছেদ আইনের আওতায় পড়েন এবং আইন-অন্তর্ভূত একুশ হাজার বিঘা জমির মালিক পাঁচ-ছয়শো জনের অধিক নয়। সুতরাং নীতিগত কারণে হায়াত সাহেব সাতশো পরিবারের পরিবার পিছু পাঁচজন করে ধরলে সাড়ে তিন হাজার ভোট হারাতে পারেন, এবং করিম সাহেবও পাঁচ-ছয়শো পরিবার থেকে ক্যানাল ট্যাক্স-বিরোধী বক্তৃতার দৌলতে বড় জোর আড়াই হাজার বা তিন হাজার ভোট পেতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে করিম সাহেব পেয়েছেন সতেরো হাজারেরও বেশী ভোট, এবং হায়াত

সাহেব পেয়েছেন মাত্র সতেরোটি। অথচ গত নির্বাচনে হায়াত সাহেব তেইশ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।

অবশ্য হায়াত সাহেব মাত্র সতেরোটি ভোটই পান নি, উপরন্তু তাঁর বাক্সের উপরে পাওয়া গেছে একটি বেগুন। এই বেগুনটি অনেকের কাছে কৌতুককর মনে হলেও আমার মনে হয়, হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাবে এই রহস্যের সমাধান করতে পারলেই।

কলকাতা শহরে বসে এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা শূন্যের পরিবর্তে যেমন 'রসগোল্লা' শব্দটি ব্যবহার করে, তেমনই একটি বেগুন দান করে কোন ভোটার হায়াত সাহেবের বাক্সকে শূন্য করবার পক্ষপাতী ছিল বা প্রতিপক্ষেরই কেউ বেগুন দিয়ে কোন তুকতাক করতে চেয়েছিল এমন মনে করা যেতে পারত। এমনকি হায়াত সাহেব নিজেও এই রহস্যটির এই ধরনের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি আমাকে জানান যে, রায়মঙ্গলের গ্রামবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নতির জন্য সরকার কোন চেষ্টাই করেন নি, সুতরাং তাদের মধ্যে কারও কারও তুকতাকে বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাটাও তিনি আমাকে জানান। এ হেন পরাজয় সত্ত্বেও সহাস্য কৌতুকে বলেন যে, কোন চাষী ভোটার হয়ত বেগুনটি তাঁকে খাবার জন্যে দান করে গেছে, বা ভোট দিতে এসে ভুলক্রমে বাক্সের উপর নামিয়ে রেখে গেছে।

এই সূত্রে কথোপকথন করতে করতে তিনি নির্বাচনের কথা ভুলে বেগুন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেন, এবং জানান যে, তাঁর বাড়ির উঠোনেও কয়েকটি বেগুনচারা ছিল এবং তাতে এক সের ওজনের বেগুনও ধরত। হায়াত সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে

বলেন, বিধানসভায় যেতে হত এবং দীর্ঘদিন কলুটোলার একটি হোটেলে বাস করতে হত। সে কারণে বেগুনের চারাগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেগুলির পরিচর্যা করতে পারতেন না, এ-কথা জানিয়ে তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বলেন যে, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তাঁর উপকারই হয়েছে, কারণ এখন আর তাঁকে কলুটোলার নোংরা হোটেলে বাস করতে হবে না, পরম আনন্দে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র ভিটাবাড়ির সামনের বাগানে বেগুনের পরিচর্যা করতে পারবেন।

হায়াত সাহেবের এই বেগুনপ্রীতির বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি যখন সন্দিহান হয়ে উঠছিলাম, এবং এর সঙ্গে ভোটবাক্সের কোন সম্পর্ক আছে কিনা মনে মনে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন তিনি একটি বিস্ময়কর খবর প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, প্রায় চার বৎসর পূর্বে তিনি একবার বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্তির পর গ্রামে ফিরছিলেন, এমন সময় গ্রামের হাটে একজনকে ঝুড়ি ভর্তি বড় বড় বেগুন বেচতে দেখে তিনি এতদূর প্রলুব্ধ হন যে, সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং কিছু বেগুন কিনতে তাঁর ইচ্ছে হওয়ায়—বেগুনওয়ালা এক সের বেগুনের জন্য তিন আনা পয়সা চায় এবং হায়াত সাহেব কোন দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সা দিয়েই বেগুনগুলি নিয়ে চলে আসেন। ঘটনাটির উল্লেখ করে হায়াত সাহেব হাসতে হাসতে আমাকে জানান যে, সে রাত্রে পেঁয়াজ সহযোগে তিনি শুধু বেগুন পোড়া দিয়েই ভাত খেয়েছিলেন।

এই সূত্রেই তাঁর হঠাৎ স্মরণ হয় যে, তিনি যখন বেগুন কিনেছিলেন, তখন পিছন থেকে কে যেন মন্তব্য করে, হায়াত সাহেবের দেখি আজকাল এক সের বেগুন না হলে চলে না।

এই স্থানীয় অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী সাফল্যের বিশ্লেষণের মধ্যেই হায়াত সাহেবের পরাজয়ের

প্রকৃত কারণ এবং ভোট বাক্সে রাখা বেগুনটির সব রহস্য, আমার ধারণা, সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, জমিদারি উচ্ছেদ, ক্যান্যাল ট্যাক্স—বহু জনে বহু মতামত হয়ত প্রচার করবেন, রাজনৈতিক দলগুলি হয়ত এই নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে কোন দলবিশেষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি বা হ্রাসের হদিস পাবেন, কিন্তু দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সায় এক সের বেগুন কেনার ফলে যে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা গদিচ্যুত হতে পারেন, এ-খবর অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য।

এই তুচ্ছ ঘটনাটিকে আমি ইতিপূর্বে বিস্ময়কর বলেছি। তার কারণ হায়াত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফেরার পথে সেই গ্রামেরই এক দরিদ্র মুসলমান চাষীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, এবং তাকে আমি স্টেশনের পথটা দেখিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করি। পরিবর্তে সে প্রশ্ন করে জানতে চায়, আমি গ্রামে কার বাড়ি গিয়েছিলাম। উত্তর শুনে চাষীটি উপহাসের হাসি হাসে এবং বলে যে, সে আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি নবাবজাদার বাড়ি গিয়েছিলাম। 'নবাবজাদা' বলতে সে কাকে বোঝাতে চায় জিজ্ঞাসা করায় লোকটি হেসে বলে যে, গ্রামে নবাবজাদা ত একজনই আছেন। ইতিমধ্যে আরও দু-চারজন লোক এসে জড়ো হয় এবং হাসতে হাসতে বলে যে, এখন তারা হায়াত সাহেবকেই নবাবজাদা সম্বোধন করে। এবং তাঁর পরাজয়ে যে তারা খুশী হয়েছে তাও প্রকাশ করে।

আমি বিস্মিত হয়ে তাদের উল্লাসের কারণ জানতে চাই। তখন একজন সহাস্যে বলে যে, হায়াত সাহেব মানুষটি ভাল ছিলেন বলেই তারা তাঁকে মাথায় করে রেখেছিল। কিন্তু বিধান সভার সদস্য হয়েই তিনি নাকি ধরাকে সরা ভাবতে শুরু করেন! আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে বলি যে, তাদের ধারণা ভুল, হায়াত

সাহেব যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বলা বাহুল্য, তাদের প্রকৃত মনোভাব জানার জন্যই আমি হায়াত সাহেবের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করি। কিন্তু এর ফলে লোকগুলি রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং জানায় যে, হায়াত সাহেবের কথা বলতেও তাদেব লজ্জা হয়। তিনি নাকি হাটে বেগুন কিনতে গিয়ে দরদস্তুর করেন না। তিন আনাই দিয়ে দেন। এবং যিনি বাড়ির গাছের বেগুন খেতেন তাঁর নাকি বর্তমানে এক সের বেগুন না কিনলে চলে না।

এরপর আমি সমগ্র অঞ্চল সফর করে হায়াত সাহেব সম্পর্কে জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত জানবার চেষ্টা করি, এবং জানতে পারি যে শুধুমাত্র এক সের বেগুনের দরদস্তুব না করে কেনার সময় যাঁরা তাঁর আশেপাশে ছিল তারা ক্রমে ক্রমে হায়াত সাহেবের পরিষ্কার জামা-কাপড়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করে। এই ভাবে নানান গুজব চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে। এবং অনেকের এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে ধারণা হয় যে বিধানসভার সদস্য হওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয় খুব বড়লোক হয়ে গেছেন! অন্যথায় হায়াত সাহেবের মত একজন দরিদ্র জননেতা এক সের বেগুন কিনবেন কেন, এবং কিনলেও দর দস্তুর না করে তিন আনা দাম কেন দেবেন?

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন গুজব রটনা শুরু হলে শেষ পর্যন্ত তা কত সুদূর-প্রসারী ক্ষতিকর হতে পারে পরবর্তী ঘটনাটি থেকেই তা প্রমাণ হবে। হায়াত সাহেব যখন বৎসর দুই আগে প্রাণপণ চেষ্টায় একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেন সরকার ও সাধারণের সাহায্য নিয়ে, তখন সকলেই বলতে শুরু করে যে তিনি এখান থেকেই দুপয়সা রোজগার করেছেন।

কিন্তু তাঁর জনকল্যাণ প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ কদর্থ করা হয় বৎসর-খানেক পূর্বে তিনি যখন রায়মঙ্গলে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করতে অগ্রণী হন। কারণ এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আরেকটি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিল বটে, কিন্তু বালিকাদের জন্য নয়।

এ-পর্যন্ত হায়াত সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের নানান কাল্পনিক অভিযোগ থাকলেও তাঁর চরিত্রের উপর কেউ কোন কটাক্ষ করে নি। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনে সকলেই রুষ্ট হয় এবং প্রশ্ন করে যে হায়াত সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ হঠাৎ বালিকাদের উপর পড়েছে কেন! ফলে তাদের সুপ্ত আক্রোশ পত্রেপুষ্পে পল্লবিত হতে শুরু করে এবং হায়াত সাহেবের মত জননেতাও অল্পদিনের মধ্যেই লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। এ-কারণেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যদিও তাঁর মত অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ দেশসেবকের শোচনীয় পরাজয়ে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছে তথাপি রায়মঙ্গল কেন্দ্রের জনসাধারণ এই পরাজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয় নি।

[১৩৬৯]

ঠগ

গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। ভিড় ঠেলে কোন রকমে বাক্স বেডিং তুলে থার্ড ক্লাস কামরার এক পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে সবে গুছিয়ে বসেছি, দেখি কি, মাঝখানের দুটো বেঞ্চি পার হয়ে ওদিক থেকে একজোড়া চোখ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে, কারণ যিনি তাকিয়ে ছিলেন তিনি পুরুষ নন, মহিলা! বয়সে আমার চেয়ে বেশ কিছু বড়।

আমার প্রায় মুখোমুখি বসেছিলেন তিনি। মাঝখানে শুধু দু-বেঞ্চির লোকের মাথা দুলতে শুরু করেছিল ট্রেনটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে। তাদের মাথার দোলানিতে অবশ্য ভদ্রমহিলার মুখটা এক একবার ঢাকা পড়ছিল, এক একবার দেখা যাচ্ছিল।

দেখা গেলে কি হবে, আমি চোখ তুলে তাকাতে পারি নি। কারণ যতবার আড়চোখে তাকাই, ততবারই দেখি তিনি ঠায় এক-দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দু-একবার সন্দেহ হল তিনি যেন ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসছেন আমার অস্বস্তি দেখে।

ফরসা গোলগাল মুখ, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, হাতে কি একটা বইও ছিল। মাঝে মাঝে তিনি সেটা পড়বার চেষ্টা করছিলেন, আর থেকে থেকে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে।

সে যে কি অস্বস্তি, বলে বোঝাতে পারব না। আমি তাই ইচ্ছে করেই জানালায় মুখ গলিয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম।

ট্রেন তখন বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ জানালায় গলা বাড়িয়ে থাকার জন্য ঘাড় টনটন করছিল, মাথা তুলতেই তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে তিনি বলে উঠলেন, কি রে, চিনতে পারছিস না ?

বেশ জোরেই বললেন, যাতে ছুটো বেঞ্চি পার হয়ে কথাটা আমার কাছে এসে পৌঁছয়।

চমকে উঠলাম প্রশ্ন শুনে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তাঁকে। কিন্তু চিনতে পারলাম না। আমাকে বোধ হয় সে-মুহূর্তে খুব অসহায় দেখাল।

আমার অবস্থা দেখে হাসলেন তিনি। বললেন, এ লাইনে কোথায় যাচ্ছিস ? মামাবাড়ি ?

বললাম, হ্যাঁ।

তারপর নানা প্রশ্ন। বাবা ভাল আছেন ? মা কাশী থেকে ফিরেছেন ? মীনার বিয়ের কিছু ঠিক হল ? নিমু চাকরিবাকরি পেল ? তার একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি আমি।

হঠাৎ একবার থেমে পড়ে বললাম, উত্তর দেব না আপনার কথার।

সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, কেন ?

বললাম, এত সব জিগ্যেস করে গেলেন, অথচ আপনাকে চিনতেই পারলাম না।

উত্তর এল, তুই বল্ না আমি কে !

বললাম, সত্যি চিনতে পারছি না।

ভদ্রমহিলার মুখ থেকে হাসি সরে গেল। ক্রমে ক্রমে মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, আমি তোর সেজোমামীমা।

উত্তর দিতে তিনি যেন বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। কিন্তু উত্তর শুনেও আমি চট্ করে বুঝে উঠতে পারলাম না।

মনে মনে আমি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করছি। সেজো-মামীমা? এ কেন সেজোমামীমা হবে!

এদিকে ট্রেন তখন এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছোট্ট স্টেশনে; তাড়াহুড়া করে সেই স্টেশনেই নেবে গেলেন তিনি। ট্রেন আবার ছেড়ে দেবার মুহূর্তে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হেসে বিদায় জানালেন।

আর স্টেশনের নামটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল। আরে, এ ত করনডিহির মামীমা, আমাদের বুলুমামীমা।

আশ্চর্য, বুলুমামীমাকে একেবারে চিনতেই পারি নি। অনু-শোচনায় মন ভরে গেল। ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকটা!

আশ্চর্য! যার কথা আমরা কোনদিন ভাবি নি, যার কোন খবরই রাখি নি এতকাল, তিনি দেখেই চিনতে পারলেন, কথাবার্তায় মনে হল সব খবরই রাখেন আমাদের, সম্পর্কটা আমরাই মুছে ফেলেছি, তিনি কিন্তু মনে মনে পুষে রেখেছেন সব স্মৃতি।

আমি তোর সেজোমামীমা।

কথাটা বারবার গুনগুন করল মনের মধ্যে। চেহারাটা তাঁর বদলে গেছে বলেই কি? না মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলেছি বলেই চিনতে পারলাম না?

সেজোমামীমা বলতেই চোখের সামনে অন্য একটি মুখ ভেসে উঠেছিল। যে মুখ গত দশ বারো বছর ধরে দেখে আসছি। মামাদের সমস্ত সংসারটি যিনি বাসুকির মত ধারণ করে আছেন মাথার ওপর। খেতে ভালবাসি বলে সারা গাঁ খুঁজে যিনি মাগুর মাছ যোগাড় করে আনেন। হঁচোড়ের তরকারি রাঁধেন চমৎকার। অর্থাৎ রাণীমামীমাকেই আমরা সেজোমামীমা বলে জানি। আর ট্রেনে দেখা ইনি হলেন বুলুমামীমা।

ব্যাপারটা এই যে, সেজোমামার দুটো বিয়ে।

রাণীমামীমা আর বুলুমামীমা।

দাদামশাই ছিলেন ও তল্লাটের বড় জমিদার। কত বড় তা ভাঙ্গা পুরানো কাছারিবাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়। বিয়ের সময় ধুমধামও কম হয় নি! ব্যাণ্ড বাজানোর দল এসেছিল কলকাতা থেকে, কারবাইডের আলোয় সাজানো হয়েছিল চতুর্দ্দিক, আর নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছু-হাজারেরও বেশি।

সে-সব ছবি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। স্পষ্ট মনে পড়ে সব।

দাদামশায় দামী শাল গায়ে দিয়ে রূপোর পাতে মোড়া ছড়ি হাতে হুকুম দিচ্ছেন সকলকে, আদর আপ্যায়ন ঠিক হচ্ছে কিনা তদারক করছেন। আর সকলেই তটস্থ, ছোটখাট কোন গাফিলতির জন্য দাদামশাই না চটে যান। চটে গেলে কারও রক্ষে নেই, প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, দাদামশাইকে মামারাও ভয় পেত। আমরা ত অনেক সময় কাছে যেতেই সাহস পেতাম না। কারণ এমনি সকলের সঙ্গে হেসেখেলে কথাবার্তা বলতেন বটে, কিন্তু তাঁর হুকুমকে ভয় পেত সকলে। একবার যা মুখ থেকে বের হবে তার নড়চড় হবে না।

বিয়ে যখন ঠিকঠাক—বাবা নাকি বলেছিলেন, যার বিয়ে তাকে একবার মেয়ে দেখে আসতে বললে হত না?

দাদামশাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, মেয়ের বাপ তার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের সঙ্গে। পাত্র দেখে যদি বিয়ে দিত ত পাত্রের মতামতের কথা উঠত।

আর এই কথাই শেষ পর্যন্ত বহাল রইল। নিজে মেয়ে দেখতে যেতে পেলেন না সেজোমামা।

বিয়ের পর টোপর-পরা সেজোমামার পিছনে পিছনে গাঁটছড়া

বাঁধা রাণীমামীমা যখন এসে নামলেন গাড়ি থেকে, তখন সব আশঙ্কা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

এমন রূপ নতুন বউয়ের?

সবাই তারিফ করল দাদামশাইকে।

বললে, পছন্দ বটে, খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকেই ছেলের বউ করে এনেছেন।

তারিফ শুনে খুশির হাসি হাসলেন দাদামশাই।

বললেন, দেখ বাপু, বুড়ো বয়সটার একটা দাম আছে। ছেলেছোকরারা ভুল করতে পারে, কিন্তু বুড়োরা ভুল করে না।

সবাই স্বীকার করল সে-কথা।

রাণীমামীমা যে শুধু দেখতেই সুন্দর ছিলেন তাই নয়, গুণও ছিল অনেক। মাস কয়েক যেতে না যেতে সে-পরিচয়ও পাওয়া গেল। সব সময়ে মুখে হাসি লেগে আছে। সংসারের যে-কাজই হোক, সব প্রথমে এগিয়ে আসবেন রাণীমামীমা। শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, ছোটদের যত্নআত্তি থেকে পুজোপার্বণের ব্যবস্থা, সবদিকেই চোখ তাঁর। শত বিপদ আপদেও মুখে হাসি লেগেই আছে!

কিন্তু সে আর কতদিন। বছর না ঘুরতেই অঘটন ঘটে গেল একদিন।

দাদামশাই বসে বসে তেল মাখছিলেন।

রাণীমামীমা সামনের কুয়োয় জল তুলছিলেন দাদামশাইয়ের স্নানের জন্য। বাড়িতে চাকরবাকর যথেষ্ট থাকলেও দাদামশাই নিজের হাতে তেল মাখতেন, আর রাণীমামীমা নিজের হাতে জল তুলে দিতেন তাঁর স্নানের জন্য।

এদিকে তেল মাখতে মাখতে হঠাৎ দাদামশাইয়ের চোখ গেল রাণীমামীমার পায়ের দিকে।

তাঁর পায়ের গোড়ালির ওপর চোখ পড়তেই কপাল কুঁচকে উঠল দাদামশাইয়ের।

গম্ভীর গলায় ডাকলেন, সেজোবউমা! এদিকে এস ত একবার।

ঘোমটাটা একটু টেনে রাণীমামীমা হাসি মুখে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দাদামশাই একটা আঙ্গুল দেখালেন রাণীমামীমার গোড়ালির দিকে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, কি এটা?

আমিও দেখি নি তার আগে। দেখে শিউরে উঠলাম। শ্বেতির দাগটুকু দেখে ঘৃণায় আতঙ্কে সরে এলাম।

রাণীমামীমা চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কিই বা উত্তর দেবেন এ প্রশ্নের।

দাদামশাই আবার প্রশ্ন করলেন, কতদিন হয়েছে?

রাণীমামীমা এবারও কোন উত্তর দিলেন না।

দাদামশাই জিগ্যেস করলেন, বিয়ের আগে থেকেই আছে?

রাণীমামীমা মাথা নীচু করে পায়ের নীচে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, হ্যাঁ।

আর কোন কথা হল না। তোলা জল হুড়হুড় করে ঢেলে দিলেন দাদামশাই, নিজে জল তুলে স্নান সেরে বেরিয়ে গেলেন বৈঠকখানায়।

সারা বাড়ি তখন থমথম করছে। সকলের মুখে চোখে আতঙ্ক! দাদামশাইয়ের ভাবগতিক দেখে সকলেই বুঝতে পারল ঝড়ের পূর্বাভাস এটা।

একে একে কানাঘুষো, ফিসফাস বন্ধ হল! শুনলাম, দাদামশাই নাকি রাণীমামীমার বাবাকে চিঠি দিয়েছেন অপমান করে। চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

সপ্তাহখানেক পরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রাণীমামীমার বাবা। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন, কত কি বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু দাদামশাই এতটুকু নরম হলেন না। সকলেই বুঝতে পারল, তাঁর মত বদলানো যায় না।

এদিকে রাণীমামীমার অত সুন্দর চেহারা, এক সপ্তাহেই কালি হয়ে গেছে। তিন মাসের রুগীর মত পাংশু মুখ, চোখের কোলে দুশ্চিন্তার দুঃখের ছায়া। শরীরে কোথাও যেন একফোঁটা রক্ত নেই। দেখলেই মনে হয় যেন কান্না থমকে আছে চোখের আড়ালে। কানা অবধি ভর্তি জলের গেলাসের মত, একটু নাড়া দিলেই যেন উপচে পড়বে।

বাবা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, মামারা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এমন কি দিদিমাও রাগ করে আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। কিন্তু দাদামশাইয়ের সেই এক কথা।—এ রোগ আমাদের বংশে কারও কখনও হয় নি, এ রোগে আমাদের বংশ নষ্ট হতে দেব না।

গাঁয়ের ডাক্তারকে ডেকে আনা হল, তিনি বোঝালেন, এটা এমন কিছু ভয় পাবার মত রোগ নয়। ছোঁয়াচে ত নয়ই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

শেষ পর্যন্ত দিদিমা বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ, বউমার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পার না? এ সময় কি যাও বললেই যাওয়া চলে?

সে কি? চমকে উঠলেন দাদামশাই। দিদিমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তাহলে আর কোন কথা চলে না, ও মেয়েকে আমার বাড়ির বউ করে রাখতে পারি না। ও রোগ জন্মগত।

কান্নাকাটি অনুরোধ উপরোধ কিছুই টিকল না। রাণী-মামীমাকে চলে যেতে হল।

রাণীমামীমা চলে যাওয়ার পর থেকে পরিবর্তন শুরু হল সেজোমামার। সব সময়ে চুপচাপ বসে কি যেন ভাবেন, একা একা থাকেন, কথা বললে বিরক্ত হন।

দাদামশাইয়ের কাছে চাপা থাকলেও আর আর সকলেই জানত। আগে জানালে হয়ত বিয়েই হত না, এই আশঙ্কায় এটুকু চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন রাণীমামীমার বাবা। বিয়ের পরই নাকি কাঁদতে কাঁদতে সে-কথা সেজোমামাকে বলেছিলেন রাণীমামীমা।

সেজোমামার দিক থেকে কোন ক্ষোভ ছিল না, কোন আক্ষেপ ছিল না তার জন্য।

তাই সবচেয়ে বেশি আঘাত পেলেন সেজোমামা নিজে। আরও আঘাত পেলেন যখন দাদামশাই বলে বসলেন, ছেলের আবার বিয়ে দেব আমি।

বেঁকে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন সেজোমামা।

সেই প্রথম বোধ হয় দাদামশাইয়ের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করার সাহস পেল।

বাধা পেয়ে আরও রেগে গেলেন তিনি। ঘটককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মেয়ে দেখতে।

ফিরে এলেন পাত্রী দেখে, বিয়ের দিন পাকাপাকি করে।

খবর পেয়ে রাণীমামীমার বাবা চিঠি লিখলেন, মেয়েকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন, সেরে উঠবে আশা দিয়েছেন ডাক্তার।

দাদামশাই হাসলেন চিঠি পেয়ে। সেরে যাবে? ও বিষ দূর করা কি সহজ কথা। পায়ের গোড়ালিতে আছে এখন, ক্রমশ সর্ব-শরীরে হবে। শ্বেতি ভীষণ রোগ, ধবলও যা, শ্বেতকুষ্ঠও তাই। আপত্তি ত শুধু রোগের জন্য নয়। মেয়ের বাপ তাঁর সঙ্গে এমন

প্রবঞ্চনা করল কেন। আগে জানায় নি কেন? সেরে গেলেও ও ঠগ জোচ্চোরের মেয়েকে বাড়ির বউ করে আনবেন না তিনি।

সেজোমামা বেঁকে দাঁড়ালেন, বিয়ে করব না আমি, বিয়ের শখ জন্মের মিটে গেছে।

বিয়ে করবে না? রেগে আগুন হয়ে উঠলেন দাদামশাই, হুমকি দিলেন, ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে শাসালেন। শেষে কোন কিছুতেই যখন কাজ হল না—আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসলেন, বিয়ের দিন ঠিক করে ভদ্রলোককে কথা দিয়ে এসেছি আমি, আমার সম্মান যদি না রইল ত বেঁচে থেকে কি লাভ। আমি আত্মঘাতী হব।

শেষ পর্যন্ত সাহস হারালেন সেজোমামা। বিয়ে করতে রাজী হলেন।

বিয়ে হয়ে গেল। রাণীমামীমার বদলে এলেন বুলুমামীমা।

সকলেই ভেবেছিল দুদিন পরেই সংসারের চাকা আবার সচল হবে। আবার সুস্থভাবে জীবন শুরু হবে সেজোমামার।

ভুল বুঝেছিল সকলে।

দাদামশাইয়ের বিরুদ্ধে সেজোমামার যত আক্রোশ সব গিয়ে পড়ল বুলুমামীমার ওপর। যেন সংসারের সমস্ত অশান্তির জন্য বুলুমামীমাই দায়ী।

বুলুমামীমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলতেন না সেজোমামা। পরিবারের অন্য সকলেও তাঁর সঙ্গে কেমন একটা দূরত্ব রেখে চলত। তাই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল বুলুমামীমার। টিকতে পারলেন না।

ছাই চাপা আগুনের মত বিতৃষ্ণায় জ্বলছিলেন বুলুমামীমা। হঠাৎ একদিন কি একটা সামান্য ব্যাপার থেকে তুমুলকাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। আর ফিরলেন না।

সেজোমামা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে একাই ফিরে এলেন।

দাদামশাই চিঠি দিলেন, তার উত্তর এল না।

সবই লক্ষ করছিলেন দাদামশাই, মুখ বুজে সহ্য করছিলেন সব কিছু। বুঝেছিলেন, ইচ্ছে থাকলে মানুষকে সবই দেওয়া যায়, দেওয়া যায় না শান্তি। বুলুমামীমার অশান্তি, সেজোমামার অশান্তি, সংসারের অশান্তি দেখতে দেখতে কঠিন অসুখে পড়লেন তিনি। বেশ কিছুদিন রোগে ভুগে মারা গেলেন।

মৃত্যুর খবর পেয়েই ছুটে এলেন রাণীমামীমা। কোলে তখন তাঁর ছোট একটি মেয়ে। যে মেয়ের জন্মের খবর পেয়েও সেজো-মামাকে দেখতে যেতে দেন নি দাদামশাই।

পাছে দিদিমা পা সরিয়ে নেন এই ভয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে প্রণাম করলেন রাণীমামীমা। দিদিমা কিন্তু দূরে সরে থাকতে পারলেন না। দুহাত বাড়িয়ে ফুটফুটে নাতনীটিকে কোলে তুলে নিলেন।

বললেন, সেজোবউমা, ভগবান যা দিয়েছেন তাকে ঘৃণা করা চলে? তোমার পায়ে যা হয়েছে তা ত আমার ছেলের গায়েও হতে পারত। তখন কি তাকে ফেলে দিতাম?

সে-কথা শুনে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে রাণীমামীমার সে-কি কান্না! দিদিমাও কাঁদল, বাড়ির সকলেই কাঁদল।

চোখের জলে সব বিষ, সব অভিশাপ ধুয়ে মুছে গেল। শান্তি নামল সংসারে।

কিন্তু দিন কয়েক পরেই বুলুমামীমাও এসে হাজির হলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর খবর জেনেও কি করে আর দূরে থাকেন।

বুলুমামীমা প্রণাম করে উঠতেই ছোট্ট ফুটফুটে নাতনীটিকে তাঁর কোলে দিয়ে দিদিমা হেসে বললেন, এই নাও তোমার মেয়ে, এবার থেকে তোমার।

—মেয়ে ? কার মেয়ে ? বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল বুলু-মামীমার !

এদিকে পরিচয় পেয়েই রাণীমামীমা ছুটে এলেন। বোনের মত স্নেহের আলিঙ্গনে বুলুমামীমাকে কাছে ডাকলেন।

কিন্তু বুলুমামীমার চোখে তখন আরও বিস্ময়! যেন ঠিক এমনটি আশা করেন নি তিনি। বোধ হয় অন্য কিছু ভেবেছিলেন, অন্য কি কল্পনা।

যেমন এসেছিলেন হঠাৎ, তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন তিনি। কেন চলে গেলেন কেউ বুঝতে পারল না।

তারপর আর ফিরে আসেন নি বুলুমামীমা। হয়ত দশ, হয়ত বারো বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু কোনদিন তাকে ফিরিয়ে আনার কথা কল্পনাও করেন নি সেজোমামা।

প্রথম প্রথম আলোচনা হত, দু-একবার নাম উঠত বুলু-মামীমার। কেউ শুধু তারই দোষ দেখত, কেউ বলত, তার কোন অপরাধ নেই।

এমনি করেই কখন যে সকলের মন থেকে বুলুমামীমার নাম মুছে গেল, কখন যে আমরা তাকে একেবারে ভুলে গেলাম, তা বুঝতে পারি নি। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই, থাকলে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, এ-সব প্রশ্নও মনে জাগে নি কোনদিন।

দশ বারো বছর পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই বুলুমামীমার সঙ্গে। চেহারা একেবারে বদলে গেছে। দেখে চেনাই যায় না। তারপর স্টেশনের নামটা দেখে মনে পড়ে গেল। কিন্তু তখন আর সময় নেই, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

বাড়ি পৌঁছে খবরটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না।

সকলের সামনেই বললাম, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে। বুলু-মামীমা—করনডিহির মামীমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ট্রেনে।

সকলেই চম্‌কে উঠল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলাম। বললাম, বুলুমামীমা কিন্তু আমাদের সব খবরই রাখেন। আমরাই শুধু তার কোন খবর রাখি না।

সকলেই গম্ভীর হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলল না। শুধু সেজোমামার মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল, কেমন যেন চাপা কান্নায় থমথম করছে। মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

তারপর এক সময় সকলে উঠে যেতে সেজোমামা ফিসফিস করে বললেন, হ্যাঁরে, আমার কথা কিছু জিগ্যেস করল ?

বললাম, কই না ত।

—কিছু জিগ্যেস করল না ?

বললাম, না।

চুপ করে রইলেন, কোন কথা বললেন না আর।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওর আর কি দোষ বল, সব দোষ ত আমাদেরই।

বললাম, যাও না সেজোমামা, গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস তুমি। এভাবে একটা জীবন নষ্ট হবে চোখের সামনে ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজোমামা বললেন, তাই ভাবছি। হ্যাঁ যাব, ফিরিয়ে আনতে যাব আমি। কাল সকালের ট্রেনেই।

বলে স্যুটকেস গুছাতে শুরু করলেন সেজোমামা। রাণীমামীমা নিজেই স্যুটকেস গুছিয়ে দিলেন! বললেন, সত্যিই ত, দোষ আমাদেরই, যাও ফিরিয়ে নিয়ে এস ওকে।

পরের দিন ভোর বেলাতেই ট্রেন।

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙতে দেখি সেজোমামা তখনও ঘুমোচ্ছেন। ডেকে বললাম, করনডিহি যাবে না ?

সেজোমামা ঘুম ঘুম চোখেই বললেন, বড় ঘুম পাচ্ছে রে, এখন থাক, দশটার ট্রেনে যাব।

দশটার সময় খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটা কাজ সেরে আসতে গেছেন সেজোমামা।

ফিরে এসে বললেন, বড় দেরি হয়ে গেল রে, বিকেলের ট্রেনেই যাব।

বিকেল বেলায় বললেন, শরীরটা ভাল নেই, তাছাড়া পরের সপ্তাহে ত ওদিক দিয়ে যেতেই হবে, তখনই বরং···।

পরের সপ্তাহে ফিরে আসতেই বললাম, করনডিহি গিয়েছিলে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজোমামা বললেন, যাওয়া আর হল কই। যা কাজের চাপ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, কোন্ মুখেই বা যাব বল্।

জিগ্যেস করলাম, কেন?

উত্তর এল, বাবাকে যদি ঠগ-জোচ্চোর বলে অপমান করে। মেয়ে দেখতে গিয়ে বাবা যে তোর রাণীমামীমার কথা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন।

চমকে উঠলাম সেজোমামার কথা শুনে। রাণীমামীমার গোড়ালির সেই সাদা দাগটুকু দেখে একদিন দাদামশাই যেমন চমকে উঠেছিলেন।

বহুদিন আগে দাদামশাইয়ের মুখে শোনা 'প্রবঞ্চনা' কথাটা হঠাৎ যেন কানে বাজল, যেন দাদামশাইকেই বিদ্রূপ করে উঠল কথাটা।

[১৩৬৪]

দেয়াল

চৌরঙ্গী রোড ধরে রেসকোর্সের পিঠ ঘেঁষে ছুটে চললো গাড়ীখানা। মোটরকার তো নয়, কক্ষচ্যুত কমেট যেন।

রেড রোডের পীচ-ঢালা মসৃণ আর পরিচ্ছন্ন পথ ধরে, রেড রোডের নির্বিবাদ নির্জনতায় পিছলে পিছলে এগিয়ে চললো রেসিং ট্যালবটখানা। কোথায়, কোনদিকে তা ওরাও জানে না!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চাঁদের ছায়া পড়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সানুদেশে। আর দূরের দিগন্তে কেল্লার কাঠিন্য ক্রমশ তরল হয়ে আসছে। কোমল হয়ে আসছে তরল তন্দ্রার আবেশে। ঈষৎ অন্ধকারের আশ্লেষে।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হালকা হাওয়ার দাপটে উড়ছে কেশের গুচ্ছ। সুজাতার রেশমের মত নরম চুল উড়ছে ফুরফুর করে। খুচরো খাটো চুলের ছড়াটা দুলছে কানের পাশে। ঝুমকোর তালে তালে।

স্টিয়ারিং ধরে রয়েছে সুকুমার শক্ত হাতে। আর ওর চোখজোড়া অন্ধকার চিড়ে চলেছে কুটিল কৃষ্ণপক্ষের বিদ্যুৎ চমকের মত।

মুখে কথা ছিলো না কারও। এতক্ষণ নিশ্চুপ নির্বাক কাটিয়ে আসছে দুজন। অথচ সে-কথা দুজনেরই কারও মনে হয়নি এতক্ষণ।

দয়িতার কাছে দয়িতের উপস্থিতিটুকুই হয়তো যথেষ্ট। ভাষার চেয়ে স্পর্শ বোধ হয় বেশী মুখর, বন্ধনের চেয়ে বিশ্বাস।

অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ কাটলো চুপচাপ। একটা পাক দিয়ে দিক বদলে সিধে চলে এলো ওরা পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে।

রাস্তার মোড়ের সবুজ সঙ্কেত-বাতিটা নিবে গেল। থমকে জ্বলে উঠলো হলুদে আলোটা। তারপর লাল। দাঁড়াতে হলো।

এ পাশের পৃথিবীতে জনতার জঞ্জাল। যান বাহনের কোলাহল আর অ্যাংলো অঙ্গনাদের কৌতুক-কাকলি। আলোর ফোয়ারা চারিদিকে। উগ্রতায় উজ্জ্বল বিজলী বাতির সমারোহ। নীলাভ নিওন আলোর বিজ্ঞাপন। চকিত চঞ্চল তরুণীদের লাস্য আর রঙিন স্কার্টের লোভানি।

স্তব্ধতার মাঝে নিশ্চুপ থাকা যায়, কোলাহলে নয়। তাই এতক্ষণের সমাহিত শান্তির পর মুখ খুললে সুকুমার।

বললে, বিশ্রী, সিগারেটটা বের করে দাও তো পকেট থেকে।

সুজাতা অভ্যস্ত।

সুকুমারের পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেটটা বের করলে সুজাতা। আর প্যাকেট থেকে সিগারেট।

একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে সুকুমারের ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে।

মুখটা নীচে নামিয়ে সেটা ধরিয়ে নিলে সুকুমার।

—কোন দিকে এবার?

—যে দিকে খুশি তোমার।

—চলো চাঁদপাল ঘাটে। জ্যোছনা রাতে ঘাটে বসতে বেশ লাগে।

আবার ছুটলো দুজনে। আবার চুপচাপ।

প্রেমিক প্রেমিকা হয়তো বিরহেই বহুবাক্ হয়, মিলনে নয়। কিংবা, কে জানে, দুজনেরই মনের মধ্যে হয়তো ঘুরছে কোন এক অজ্ঞাত চিন্তা।

হ্যাঁ। সুজাতা ভাবছে।

সুজাতা ভাবছে ইন্দ্রাণীর কথা।

ইন্দ্রাণী এসেছিলো, ইন্দ্রাণী চলে গেছে। কিন্তু পিছনে ফেলে গেছে সে অদ্ভুত এক অবোধ্য বিস্ময়। রেখে গেছে আশঙ্কা আর আসান।

কিন্তু সুজাতা বুঝতে পারে না।

এক সূর্যকে ঘিরে অসংখ্য সূর্যের চংক্রমণ। অসংখ্য সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে অজস্র চন্দ্র, তারকা, জনবহুল পৃথিবীর জঞ্জাল। ভোরের সূর্য ওঠে প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায় জাফরানী দিক্-চক্রবালের আড়ালে স্তিমিত মধুজ্যোৎস্নার চন্দ্রোদয়। তবু, তবু কি করে হঠাৎ পথ ভেঙে আসে ধূমকেতু! ভ্রান্ত পথে কি করে সম্ভব হয় অকস্মাৎ বহ্নিপুচ্ছের আবির্ভাব?

সুজাতা আজও বুঝতে পারে না।

পিছন পানে তাকিয়ে দেখেছে সে বহুবার। স্মৃতির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে করেছে সন্ধান। কিন্তু, না, পায় নি অনুসন্ধানের ইশারা। চোখ তার দিশেহারা।

সুকুমারের সঙ্গে আলাপ করেছিলো ও নিজের স্বার্থে নয়। সুকুমার সম্বন্ধে সেদিন ওর কোন দুর্বলতা ছিলো না বলেই যেচে আলাপ করতে পেরেছিলো সুজাতা।

কলেজে কাটিয়ে আসা দিনগুলো মনে পড়ে যায় সুজাতার। সে, ইন্দ্রাণী আর অশোকা। সুকুমারও ছিলো ওদেরই সতীর্থ। ক্লাসের ভালো ছেলে। তর্কে তীর্থঙ্কর। তাই ঠাট্টা করে সুজাতা ওর নাম দিয়েছিলো 'সবজান্তা'। প্রেমের পাত্রকে কেউ কি আলাপের পূর্বেই বিদ্রূপ করতে পারে? না। সুকুমারের সঙ্গে ও আলাপ করেছিলো নিজের স্বার্থে নয়।

দিনের পর দিন। আলস্যে আয়েশে গড়া সেই ক্লান্তিময় পাঠ্যজীবনে—খুব বেশী দিন কি কেটে গেছে? না, এই তো একটা বছর আগে—ইন্দ্রাণী ছিলো সুজাতার সবচেয়ে আপন সহচরী। অন্তরঙ্গ আর আন্তরিক।

ভালবাসার কথা বলতে পারে না সুজাতা, তবে এটুকু সে জানে যে ইন্দ্রাণীর ভালো লেগেছিলো সুকুমারকে। চোখের চাওয়ায় হঠাৎ পাওয়া মুগ্ধ মনের রোমন্থন নয় শুধু। অন্তর্মনের ভালো লাগা, যা কিনা আওতা আর আলোয় ভালবাসার পূর্ণতা পায়। স্নেহ আর মমতা দিয়ে গড়ে তুললে যা অঙ্কুরকে করে বনস্পতি, প্রেমকে পবিত্র।

কিন্তু ইন্দ্রাণী ছিলো অত্যন্ত লাজুক মেয়ে। অভিসারিকা নয়, অপেক্ষিতা। তাই, সুজাতাকে অনুরোধ করতো। নিজে পারতো না আদায় করে নিতে তার মনের পিপাসাকে শান্ত করবার মতো পানীয়।

ইন্দ্রাণীই প্রথম ওকে সচেতন করে তোলে সুকুমার সম্বন্ধে। আর কল্পনায় আঁকা ওদের অনেক, অনেক মানস মন্থনের ছবি হঠাৎ কবে যে সুজাতার মনকেও দুলিয়ে দিলো তা সে নিজেও জানে না। ওর শুধু মনে পড়ে, দু-একটা শান্ত রাত্রির চিন্তা চাঞ্চল্য। দিনের সম্পদ ওকে অনুভূতির সাগর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। কিন্তু, রাতের সংঘাতে বুক কেঁপে উঠতো ওর, শীতার্তা শালিকের মত।

নিঃস্ব, নিঃসহায়, নিঃশেষিত মনে হতো নিজেকে। প্রেমের পান্থশালায় পথিকের সন্ধান করতো সুজাতা, অভিরাম স্বপনমুগ্ধ তন্দ্রাক্রান্ত নয়নে। আর, কেবলই তার চোখে ভেসে উঠতো সুকুমার। সুকুমার আর ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী—যে ইন্দ্রাণী প্রতিষ্ঠার কাঠামো গড়ছে—পান্থশালা নয়।

তাই।

তাই, ইন্দ্রাণীর জন্যই সুকুমারের সঙ্গে আলাপ করেছিলো সে। ইন্দ্রাণীর বুকের ভার রঙিন রামধনুকের লঘুরশ্মিতে সুমধুর করে তোলার প্রচেষ্টায়।

আর ভাবতে চায় না সুজাতা!

এমন রাতে আর ভাবতে ভালো লাগে না। বড়ো বেশী অপরাধী মনে হয় নিজেকে।

মনে হয় ইন্দ্রাণীর ওপর বড়ো বেশী অবিচার. করেছে সে। শুধু অবিচার নয়। বঞ্চনা।

—কি ভবছো বলো তো ?

হেডলাইটের আলোয় চকচক করছে সামনের পথ, সেদিকেই স্থিরনিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে সুকুমার প্রশ্ন করলে।

সুজাতা বিমর্ষ হাসি হাসলে।—কিছু না।

না, কিছু ভাববে না সুজাতা। এমন সুন্দর ছোট্ট পৃথিবীটাকে ব্যথায় বৃদ্ধ করে তুলে কি লাভ ?

সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলে সুজাতা। তার মন থেকে মুছে মিলিয়ে দিলে সব গ্লানি !

শেষ বর্ষার মুখর রাতটা হঠাৎ বসন্তের বাতাসে স্নিগ্ধজ্যোতি সুগন্ধে ভরে উঠলো যেন।

সুডোল সুপুষ্ট ফরসা ধবধবে হাতখানা। গজদন্তে খোদাই করা মোমে মাজা হাতখানা জ্যোছনার দুধে ভিজে মোহনীয় দেখালো, মনোমুগ্ধকর মনে হলো সুকুমারের লোভাতুর চোখে। সুজাতা বুঝতে পারলে।

ধীরে ধীরে তার নরম সুশুভ্র বাহুখানা কাঁধের ওপর রাখলে সুজাতা। হালকা করে।

বসন্তের মাধুর্য শুধু পুষ্পবাহুল্যেই নয়। পরিবেশ আনে প্লাবন, মন দেয় মমতা মদিরতা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুকুমার হঠাৎ প্রশ্ন করলে। এবার ফেরা যাক, কি বলো বিশ্রী ?

সুজাতা ফিরে তাকালে। চকিত চোখে ফিরে তাকালে সুকুমারের দিকে। বিপরীত বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে কয়েকটা খুচরো চুল সুকুমারের কপালে। সেইদিকে স্থির মধুর হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে সুজাতা অনুরাগ আর আদুরে গলায় বললে, না। ফিরতে ইচ্ছে করছে না আমার মোটেই!

—বাঃ রে। সারারাত কি মোটর-বিহার করবে নাকি?

—সারারাত? সারা জীবন এমনি করে তোমার পাশে পাশে ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করছে।

সুকুমারের গলার স্বরও একটু গাঢ় হয়ে এলো। একটু ম্রিয়মাণ ব্যথার স্বরে ও বললে, সে ইচ্ছা চরিতার্থ করার উপায় যে নেই তা তো নয়।

বলে কি যেন শোনবার জন্য অপেক্ষা করলে। তারপর নিজের থেকেই আবার বললে, কেন রাজী নও বলো তো? সত্যি কি তোমাকে সুখী করতে পারবো না আমি?

সুজাতার কানে বোধ হয় সব কথাও গেলো না। ও হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলো। নিস্তব্ধ নিশীথের দেয়ালে দেয়ালে ফেটে পড়লো ওর হাসি! যেন অদ্ভুত হাস্যকর কোন কথা, কৌতুকপূর্ণ কোন রঙ্গের অবতারণা করেছে সুকুমার। কালো জমাট অন্ধকারের হালকা বাতাসে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়লো সুজাতার হাসি। পাথরের গায়ে ঝড়ে পড়া নির্ঝরের নিক্কণ যেন। উচ্ছ্বসিত সশব্দ হাসির লাস্যমুখরতায় সুকুমারের গায়ের ওপর ঢলে ভেঙে পড়লো সুজাতার নরম দেহবল্লরী।

হাসি থামিয়ে সুমিষ্ট চোখে তাকালে সে সুকুমারের দিকে।

বললে, রাজী নই এমন কথা—

বাকীটা শেষ করতে পারলে না সে। হাসির তুফানে চাপা পড়ে গেলো শেষের কথাগুলো।

রেসিং ট্যালবটের স্পীড বেড়ে গেল। হয়তো আনন্দের আতিশয্যে। হয়তো উদ্দাম উদ্দীপনায়।

পিচ্ছিল গতিতে ছিটকে ছুটে চলেছে গাড়ীখানা। বাড়ীর পথে। আর ওদের দুজনকে ঘিরে নেমে আসছে অন্ধকার। ঠাণ্ডা আর নরম, নরম আর নিঃশব্দ অন্ধকার নেমে আসছে। নীলাভ জ্যোছনায় ভেজা স্বস্তির কুয়াশা।

পীচ-ঢালা মসৃণ পথের এপাশে ওপাশে জ্বলছে ছড়ানো তারার মত নানারঙের আলো। নিওন বাতির বিজ্ঞাপন আর তিনরঙা সঙ্কেত দীপের ক্রমপরিবর্তন। ধূসরবর্ণা সান্ধ্যশর্বরীর গায়ে চাঁদ আর তারা।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে সুজাতা। ঘুম নামে না তার চোখে।

তেতলার ছোট্ট ঘরটিতে তার কুমারী পালঙ্কের কোমল শয়নেও শান্তি পায় না সে। এপাশ ওপাশ করে।

হালকা হাওয়ায় দরজার ভারি পর্দাটা কাঁপছে সিরসির করে। আর ছোট্ট জানালার আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে এক টুকরো সাদা মেঘ।

ঘুম আসে না সুজাতার। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শুয়ে থাকে সে। আর! আর ভাবতে থাকে বিগত দিনের কথা। রোমন্থন করতে থাকে মনে মনে তার বিস্মৃত অতীতের কাহিনী।

ইন্দ্রাণীকে মনে পড়ে।

ইন্দ্রাণীর প্রতি অবিচার করেছে সে। প্রবঞ্চনা করেছে তীর্থ-বান্ধবীর সঙ্গে।

হ্যাঁ। সুকুমারের বৈশিষ্ট্য তার চোখে পড়ে নি। তার রূপের

মধ্যে সুজাতা পায় নি কোন ঋজু-রোহিতের উজ্জ্বল ইন্দ্রজাল। সুকুমারের অর্থের আধিক্য তার মনকে অকর্ষণ করে নি। তার জ্ঞান গাম্ভীর্য আর শ্রেণী শ্রেষ্ঠত্ব প্রলুব্ধ করতে পারে নি সুজাতাকে।

কিংবা, কে জানে, হয়তো এ-সবই মিথ্যা। তাই মনে হয় সুজাতার। সত্যিই তো। আসলে সহস্র শুক্তির মধ্যে মুক্তোর খোঁজ পায় নি সে। ইন্দ্রাণী পেয়েছিলো সে খোঁজ। ইন্দ্রাণী ভালবেসেছিলো সুকুমারকে। শিক্ষিতা আর বয়স্কা তরুণীর অন্তর্মনের দ্বৈরথ-দ্বন্দে ঘেরা প্রমত্ত প্রেমের মধ্যে ডুব দিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছিলো সে বহু প্রতীক্ষার প্রেমিককে। হ্যাঁ, সুজাতার সাহায্যে। সুজাতা সত্যি সহানুভূতির চোখে দেখতো ইন্দ্রাণীকে।

কিন্তু।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা দম্‌কা ঝড় এসে সব উল্টে দিলে। এমনও যে হতে পারে তার জীবনে, বছর খানেক আগেও সুজাতা তা ভাবতে পারতো না।

বিদ্রূপের স্বরে ও একদিন সুকুমারকে বলেছিলো, ইন্দ্রাণীর অসাক্ষাতেই বলেছিলো, আপনার বান্ধবীটি আপনার কি নাম দিয়েছে জানেন?

—কি? মিষ্টি হেসে সুকুমার প্রশ্ন করেছিলো।

—সবজান্তা। আর আপনার ওই বন্ধুটি—দিনরাত যে করিডরে পাক দিয়ে বেড়ায়। ওর নাম হচ্ছে চরকি।

সুকুমার হেসে বলেছিলো, নামকরণে রুচির পরিচয়ই দিয়েছেন উনি। কিন্তু আমাদের আরেকটি বন্ধুর নাম কি—ওই যে গরদের ধুতি পরে আসে যে? ওর নাম হলো—

কথা শেষ করতে না দিয়ে সুকুমার বলে উঠলো, আপনাদেরও এক একটা বিশেষ নাম আছে আমাদের কাছে।

—যথা ?

—দলগত ভাবে আপনারা অর্থাৎ আপনার, ইন্দ্রাণীর আর অশোকা দেবীর নাম হলো থি্ মাসকেটিয়ার্স।

—আর আপনাবা তিনমূর্তি। নামটা প্রায় একই আছে দুপক্ষে। আমার ব্যাক্তিগত নামটা কি ?

—আপনার মতো বিশ্রী সুন্দর চেহারার কোন তরুণীর বিশ্রী ছাড়া আর কি নাম হতে পারে ?

—বিশ্রী সুন্দর ? কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠেছিলো সুজাতা।

বলেছিলো, বিশ্রী আবার সুন্দর হয় ?

—সৌন্দর্যটাই তা হলে বিশ্রী। ব্যাপার কি জানেন, সব জিনিসেরই একটা সীমা থাকে।

—রূপেরও। সেটা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন সেটাকে বলতে হয় অদ্ভুত সুন্দর বা বিশ্রী সুন্দর।

—সেই জন্যই তো আপনার নাম দিয়েছি, 'সবজান্তা'। সুজাতা হাসতে হাসতে বললে।

সুজাতা হেসেছিলো সেদিন, কিন্তু হালকা মনে নয়। ওর খাটো জীবনে কেউ কোনদিন রূপের প্রশংসা করে নি। অন্তত ওর মুখের সামনে। কোন পুরুষের কাছ থেকেই প্রশংসা পায় নি ও। পায় নি সৌহার্দ্য, সঙ্গ, সম্মান।

তার কারণও সুজাতা বুঝতে পারে।

অদ্ভুত সুন্দর ও। আর যথেষ্ট ধনী পিতার মেয়ে। নাচে আর গানে ওর পারদর্শিতার কীর্তি কারও কাছে অজ্ঞাত নয়। আর পরীক্ষার পড়ায়। অর্থাৎ মেয়েরা যেদিকে যতখানি শ্রেষ্ঠত্ব পেতে পারে। ইংরাজীতে যাকে বলে অ্যাকমপ্লিশ্‌ড—সুজাতা হল সেই জাতের মেয়ে। তাই! তাই কোন পুরুষই সাহসে ভর করে ওর কাছে

এগিয়ে আসতে পারে নি! চাঁদ আর হাতের মাঝখানে ব্যবধান অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হয়েছে সবার চোখে। হয়তো অনেকেই ভাল বেসেছে সুজাতাকে, মনে মনে, দূর থেকে। ফেলেছে ব্যথিত বুকের হতাশ দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু পারে নি এগিয়ে আসতে!

সেই কারণেই সুজাতার বুকের কোমল কোণের একটা কক্ষ ছিল এতদিন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। ভাববার সুযোগ পায় নি ও, সুযোগ মেলে নি ভালবাসবার।

সুকুমারের কথায় গুপ্তকক্ষের দ্বার হঠাৎ খুলে গেলো। উদ্বুদ্ধ হলো সুপ্ত চেতনা।

সুজাতা ভালবেসে ফেললে সুকুমারকে। আজ নিস্তব্ধ রাত্রিতে নির্জন শয্যায় একাকী শুয়ে শুয়ে সেদিনকার কথাগুলো মনে পড়ে যায় সুজাতার। আর একটা ব্যথিত বাষ্পের কুণ্ডলী দুলে দুলে উঠতে থাকে তার আশঙ্কা-শঙ্কিত বুকে। দুঃখ আর অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে তার—ইন্দ্রাণীর জন্য।

ইন্দ্রাণী এসেছিলো, ইন্দ্রাণী চলে গেছে।

পিছনে ফেলে রেখে গেছে সে আত্মগ্লানির ইতিহাস। বঞ্চনার বেদনা।

সুজাতা জানতো ইন্দ্রাণী আর ফিরবে না। লঘুসূত্রের বন্ধনে বাঁধা ছিলো তারা এতদিন। সে বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। ইন্দ্রাণী বুঝতে পেরেছে তা। ইন্দ্রাণী আর ফিরবে না।

কিন্তু, আজও কেন ইন্দ্রাণীর চোখের আড়ালে রাখলো ও সব কিছু। কেন গোপনীয় যা কিছু তা বলে ফেললে না। নিশ্চয় ক্ষমা করতো তাকে ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীর কথাগুলো মনে পড়ছে তার।

—তার জন্য, তাকে বিয়ে করার জন্য তো পাগল হয়ে উঠে-ছিলাম এক সময়।

সুজাতা বলেছিলো, ভালো রেজাল্টের পিছনে কি ছিলো তা ভেবে দেখিস।

সুজাতার বড়ো কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে যে, ইন্দ্রাণী আজও তাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। বলেছে, ভাগ্যিস তুই সাবধান করে দিয়েছিলি সুকুমার সম্বন্ধে।

সুজাতা অনেক মিথ্যে অভিনয় করেছে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে।

সুকুমার নাকি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। সুকুমারের সঙ্গে আর দেখা হয় না তার।

নিজের মনেই বিষণ্ণ হাসি হাসে সুজাতা।

ইন্দ্রাণী যদি জানতে পারতো, জানতে পারতো যে কয়েক ঘণ্টা পরেই পাশাপাশি বসে মোটর বিহার করতে বেরোবে তারা দুজন। সে আর সুকুমার। তা হলে, তা হলে হয়তো সব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতো ইন্দ্রাণীর চোখে। আর সুজাতা বেঁচে যেত। ভবিষ্যতে আবার কোনদিন ইন্দ্রাণী আসতে পারে এই আশঙ্কা থেকে।

আশ্চর্য!

অদ্ভুত!

অবোধ্য!

ইন্দ্রাণী ছিলো তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু!

বিস্বাদ চিন্তার গ্রাসে ছটফট করতে থাকে সুজাতা। বিছানার ওপর গড়াগড়ি দেয়। একটু ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য হাঁপিয়ে ওঠে সে।

ঝড় আসছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট আকাশের দিকে চেয়ে থাকে সুজাতা। চেয়ে চেয়ে দেখে, দূরের দিগন্তে ঝড়ের পূর্বাভাষ। কালো কালো মেঘ নেমে আসছে। চাঁদ ঢেকে দিয়ে মেঘ নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে।

সুজাতার নরম গালে লাগছে জলো বাতাস। বৃষ্টি আসছে—ঝড় আর বৃষ্টি।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে এসে জানালার কাছে দাঁড়ালে সুজাতা। ঠাণ্ডা গরাদের ফাঁকে মুখ রেখে। লোহার গরাদে নরম গাল চেপে।

তুষার কণার মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টির খুদগুঁড়ো এসে লাগছে সুজাতার মুখে চোখে। একটু আরাম বোধ করে সে। বিগত দিনের কথাগুলো যেন আর তেমন তীব্রভাবে হুল ফোটাচ্ছে না তার পাঁজরে পাঁজরে।

ইন্দ্রাণী এসেছিল, ইন্দ্রাণী চলে গেছে।

মেঘ নেমে আসছে, মেঘ সরে যাবে।

না। মেঘ সরে যাবে না। আসছে বৃষ্টি। ঝড় আসছে। সুজাতার চোখের সামনেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এগিয়ে এলো ঝড়ো মেঘ। মদো রক্তে মাতলামি লেগেছে পৃথিবী শিয়রে। ঝড় আসছে—বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত নদী আর সমুদ্র কাঁপিয়ে ঝড় আসছে। চাঁদ আর তারার মুখে কালিমার কলঙ্ক লেপে দিয়ে এগিয়ে আসছে ঝড়। আঁধি আর তুফান। ঝড়ের ঝঙ্কার বাজছে চারিদিকে।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। সারা-তুনিয়ার বুকের ওপর নেমে এলো বর্ষার মুখরতা।

জানালাটা বন্ধ করে দিলে, সুজাতা। দরজাটাও।

অন্ধকারে বিছানার ওপর বসে রইলো চুপ করে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে কান পেতে শুনলে সে বাইরের বৃষ্টির উন্মাদনা। শিকর প্রক্ষেপের আর্তনাদ।

উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললে এবার।

তাকিয়ে দেখলে চারিপাশ। তেপায়াটার ওপর রাখা রজনীগন্ধা

আর পদ্মের গুচ্ছ গেছে শুকিয়ে। না, ভালো লাগছে না সুজাতার। এভাবে আটকে পড়ে থাকবে কি করে সে!

অসহ্য।

সুকুমারের কথাটা মনে পড়লো।—কেন রাজী নও বলো তো বিশ্রী?

রাজী সে নয়, একথা কি কোনদিন সে বলেছে সুকুমারকে? কিন্তু, না বললেও তার মন হয়তো তাই বলতে চায়। কিন্তু, সে যে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তার মনের অভিব্যক্তি।

কথাটা ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় সুজাতার।

অসহ্য।

ওর চোখ ঠিকরে পড়লো দেয়ালের দিকে। দেয়াল—তার চারপাশ ঘিরে শক্ত ইটের দেয়াল। ইঁট আর চুন আর সিমেণ্টের শক্ত দেয়াল তার চারপাশে। আর মাথার ওপরে কংক্রিটের ছাদ। চারদিক থেকে যেন পিষে মারবার ষড়যন্ত্র করছে এরা।

আর বাইরে অফুরন্ত বাতাস। ঠাণ্ডা আর হালকা বাতাস বাইরে। আর ফুলের পাপড়ির মত নরম বৃষ্টি। বাতাস আর বৃষ্টি।

হঠাৎ কপাট খুলে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এলো সুজাতা। খোলা ছাদে! বৃষ্টির মাঝে।

মুক্ত আকাশ থেকে পড়ছে রূপালী বৃষ্টি।

[১৩৫৪]

রায়

দেবীপুরের বউকে এর আগে কেউ কখনও রাগতে দেখে নি।

বাবলাডিঙের সামন্ত-বাড়ির ছেলে নিরঞ্জন দেবীপুরের সুদাম হাজরার মেয়ে মুকুলকে বিয়ে করে ঘরে আনার পর থেকেই বাপের বাড়ির গাঁয়েব নামেই মুকুলের নামকবণ হয়েছিল—দেবীপুরের বউ। যেমন এ-অঞ্চলের সব গাঁয়েই হয়, সব বাড়িতেই হয়। বউদের আসল নাম স্বামীবাও ভুলে যায়, বেঁচে থাকে শুধু বাপের বাড়ির গাঁয়ের নামটা।

দেবীপুরের বউ যখন এসেছিল এ-গ্রামে সামন্তদের বাড়িতে, তখন তার রূপের প্রশংসায়, গুণেব কীর্তনে কান পাতাই দায় ছিল। প্রশংসা করবার মত রূপ অবশ্য এখনও আছে তার। বিজয়ার দিন সামন্তদের দরদালানে যে গেছে সে-ই দেখেছে। যে দেখেছে সে-ই তাকিয়ে থেকেছে দুর্গা-প্রতিমাকে ভুলে এই রক্তমাংসের প্রতিমার দিকে। পূজামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। বিসর্জন যাবে প্রতিমা, তাই মেয়ে-বউরা বরণ করছে প্রতিমাকে। হাতে কাঁসার বগিথালা, থালায় পান সুপুরি মিষ্টি কলা সিঁদুর আলতা সাজিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে প্রতিমার চারপাশে ঘুরছে সে, ঘুরছে সবাই। কেউ প্রতিমার পায়ে আলতা পরাচ্ছে, কেউ প্রতিমার সিঁদুর সিঁথিতে ঠেকিয়ে তুলে রাখছে ফুল-বেলপাতার সঙ্গে। কিন্তু তার মধ্যে কোন্ জন দেবীপুরের বউ তা বলে দিতে হয় না। প্রতিমার চেয়েও সুগঠনা, প্রতিমার চেয়েও সুন্দরী যে—সে-ই। অন্য সকলের চেয়ে আধ হাত লম্বা, সবল পরিপূর্ণ চেহারা, ফরসা ঝকঝকে মুখে-কপালে ঘামের বিন্দু, আর টিকলো নাকের ডগাটা যার লাল হয়ে উঠেছে—সে-ই।

এখন লালপাড় গরদের শাড়িতে মুখখানা থমথমে দেখায় বটে,

কিন্তু আগে দেবীপুরের বউয়ের মত এমন মিশুকে মানুষ ছিল না। সব সময়েই টানা-টানা চোখ ছুটি যেন হাসছে। হেসে গড়িয়ে পড়ত কৌতুকে ডেকে আলাপ করত কোটালদের বউ-ঝিদের সঙ্গেও। কেউ কেউ বলত বটে যে, দেবীপুরের বউয়ের হাবেভাবে কোথাও যেন একটা দাম্ভিকতা লুকিয়ে আছে ; কিন্তু তা বোধ হয় সত্যি নয়। কারণ তাকে কেউ কোনদিন রাগতে দেখে নি, কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে দেখে নি।

সেই মানুষ যে কেন এমন একটা কাণ্ড করে বসল কেউ বুঝতে পারে না।

প্রতি বছর এ-সময় ন্যাংটেশ্বরের মেলা বসে বাবলাডিঙে। বেশ বড় মেলা। চারপাশের গাঁ থেকে লোক ভেঙে পড়ে। দূর দূর জায়গা থেকে আসে দোকানীরা, টিকিট কেটে জায়গা নেয়, চালা তোলে, দোকান খোলে।

ন্যাংটেশ্বরের পূজো দিয়ে ভোগের থালাটা হাতে করে ফিরছিল দেবীপুরের বউ। ছ পাশের দোকানগুলোর দিকে আকাতে তাকাতেই আসছিল। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত। তারপরই তরতর করে বাড়ি ফিরে এসে ভোগের থালাটা নামিয়ে রেখে বললে, মানো, কোটালদের ডাক্ তো একবার।

কোটালরা বংশপরম্পরায় সামন্ত-বাড়িতে লেঠেলের কাজ করে এসেছে। জমিদারি গেলেও তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কমে নি এখনও। বিশেষ করে দেবীপুরের বউ কিছু আজ্ঞা দিলে কাজ হাসিল করতে পিছপাও নয় তারা।

খবর পেতে না পেতে ছুটে এল জনকয়েক। চমকে উঠল সবাই। দেখল, দেবীপুরের বউয়ের কপালের শিরাটা ফুলে উঠেছে, রাগে চোখ ছুটো রাঙা হয়ে উঠেছে।

হুকুম শুনেই ছুটল তারা। লোকটাকে ঠেঙিয়ে তাড়াতে বলেছে দেবীপুরের বউ।

লোকটা মার খেল, ভুগল দিনকয়েক হাসপাতালে পড়ে পড়ে। তারপর সেখানে শুয়েই এজাহার দিল পুলিসে। মারা গেল আঠারো দিনের দিন। দেবীপুরের বউ জড়িয়ে পড়ল মামলায়। দেওয়ানী নয়, ফৌজদারী। খুনের দায়ে। আর মামলার প্রধান আসামী কি না দেবীপুরের বউ!

মামলার খবর শুনেই ছুটতে ছুটতে এল মানিক হাজরা। দেবী-পুরের বউয়ের ছোট ভাই। এসে শুনল জামিন নিয়ে ফিরে এসেছে দিদি, কিন্তু নিরঞ্জন রয়ে গেছে সদরে। মামলার তদ্বির করতে।

এদিকে গাঁয়ের লোক কিছুই বুঝতে পারে না। কী করে এমন কাণ্ড ঘটল, কেন ঘটল! লোকটা কি খারাপ চোখে তাকিয়েছিল দেবীপুরের বউয়ের দিকে? টিটকিরি দিয়েছিল? না কি—

কানাঘুষো গুজব যে রটবে তার একটা সূত্র থাকা চাই। সেটুকুরই অভাব এখানে। আর দেবীপুরের বউকে কেউ যে কিছু জিজ্ঞেস করবে সে-সাহসই কারও নেই। সেই যে জামিন নিয়ে এসে কপাটে খিল দিয়েছে, খুলছে না কারও ডাকে।

মানিক হাজরা আসতেই ছুটে এল বাড়ির পাটকরুনী ঝি মানো।

বললে, দেবীপুর থেকে তোমার ভাই এসেছেন মা, দেখা করতে।

ভাইয়ের কথা শুনেই কপাট খুলে বেরিয়ে এল দেবীপুরের বউ। লজ্জায় গ্লানিতে যেন সে চেহারা ভেঙে পড়েছে একেবারে। চোখে উদ্‌ভ্রান্তের মত দৃষ্টি। মুখ তুলে তাকাতেই লজ্জা।

বারান্দায় মানিককে একটা আসন পেতে দিয়ে থামে ঠেস দিয়ে বসল দেবীপুরের বউ। চিরকালের অভ্যাসে হাতপাখাটা টেনে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করল ভাইকে। কিন্তু কথা বলল না একটাও।

রোদে পুড়ে আলপথ ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে বটে মানিক, কিন্তু পাখার বাতাস খেয়ে জিরোবার বা জুড়োবার মত মনের অবস্থা নয় তার।

তাই খানিক চুপ করে থেকে যখন দেখল দিদি তার একটা কথাও বলছে না, তখন নিজেই প্রশ্ন করলে, কী ব্যাপার বল্ তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেবীপুরের বউ।—শুনেছিস ত সবই।

—তা ত শুনেছি। কিন্তু সত্যি মারতে বলেছিলি লোকটাকে?

—বলি নি? দেবীপুরের বউয়ের চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল। বললে, মারতে নয়, মেরে ফেলতেই বলেছিলাম।

বিস্ময়ে আতঙ্কে চোখ তুলে তাকাল মানিকঃ কেন? কী করেছিল লোকটা?

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল দেবীপুরের বউ। তারপর তার ফরসা হাতখানা এগিয়ে ধরল মানিকের চোখের সামনে। এই দেখ্, এরই জন্যে—সারা জীবন আমার নষ্ট হয়েছে। রাগ হয় না, বল তুই?

ফরসা সুডোল হাতখানার দিকে তাকিয়ে ছেলেবেলার সেই দৃশ্যটা মানিকের চোখের সামনে ভেসে উঠল!

মানিক আর মুকুল। ভাই আর বোন। দেবীপুরের সুদাম হাজরার ছেলে আর মেয়ে। পিঠোপিঠি ভাইবোন। যেমন ঝগড়া-খুনসুড়ি লেগে আছে দিনরাত, আর তেমনি গলায় গলায় ভাব দুটিতে। দেখে দেখে মা হাসে বাপ হাসে। এ ওর নামে লাগাচ্ছে, ও এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, আবার পরস্পর পরস্পরকে সাক্ষী মানে দরকারের সময়।

মা কান ধরে মেয়েকে হিড়হিড় করে টেনে এনে প্রশ্ন করল, রায়দের বাগানে গিয়েছিলি আম পাড়তে?

মানিক অমনি এসে সাক্ষী দেবে, মারছ কেন দিদিকে ? ও তো বৈঠকখানায় বসে ধান-ঝাড়াই দেখছিল।

মা ছেলের চুলের মুঠি ধরে বলল, ছিপ ফেলেছিলি পাঁজাপুকুরে ? মুকুল অমনি এসে বলবে, ও তো গড়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বাকুড়ি-জমির নিড়েনি দেখছিল।

তারপর মায়ের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ হাসিয়ে ছুটে পালাবে। কেমন, বাঁচিয়ে দিলাম তো!

দুটিতে যেমন ঝগড়া, তেমনি ভাব। দুজনেই গাঁয়ের মিড্‌ল প্রাইমারী ইস্কুলে যায় বইখাতা বগলে নিয়ে, খেজুবগড়ে 'ডাঁড়' ফেলে পাশাপাশি মাছ ধরতে বসে, সুধাসায়রে সাঁতার কাটে একসঙ্গে।

সুদাম হাজরার অবস্থা তখন পড়তির দিকে। জমিজমা, বংশ-পরিচয়, নগদ টাকা—সবই ছিল তার। এমন কি জমিদারির তিন-আনি অংশও—পুত্রহীন মাতামহীর সূত্রে পাওয়া। কিন্তু কাল হল তার নেশা—ব্যবসার নেশা। গাঁয়ের বাঁড়ুজ্যেরা বলগনায় ধান-কল খুলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে দেখে, সুদাম হাজরাও কপাল ঠুকল গণেশের পায়ে। ব্যবসা শুরু করল কাঠ আর কয়লার। গদি কিনল নিগন ইস্টিশনে। বি. কে. আর-এর ছোট লাইনের ধারে লিগন তখন গঞ্জ হয়েছে, ব্যবসা জমেছে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল ফেঁপে ফুলেই উঠবে বুঝি। কিন্তু পাল্লা ঘুরে গেল তার গদির পাশে এক মাড়োয়ারী আঁড়ত খুলতেই। বছর দুই লোকসান খেয়ে খেয়ে ধৈর্য ধরে ধরে থেকে শেষ অবধি দোকানে কুলুপ মেরে দেবীপুরেই ফিরে আসতে হল। ঘাড়ের ওপর তখন একরাশ দেনা, আর বাড়ন্ত ফাঁপালো চেহারার মেয়ে মুকুল। ধারদেনা শোধবার কথা দূরে, আর কটা বছর পরেই তো বেরোতে হবে দু-দুটো খোঁজে। জমিজমা বন্ধক রেখে

টাকা যোগাড় করতে হবে এক দিকে মেয়ের বিয়ের পণ দেবার জন্যে, আর-এক দিকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হবে পাত্রের সন্ধানে।

তবে মুখে একথা বললেও মনে মনে মুকুলের মা-বাবা অন্য স্বপ্ন দেখত। আর সে-স্বপ্নে রঙ চড়াত গাঁয়ের লোক, বলত, হাজরা, তোমার আবার মেয়ের বিয়ের ভাবনা!

—নয় কেন?

—পাঁচটা গাঁ বেছে আন দিকি মুকুলের মত মেয়ে! প্রশংসার স্বরে বলত সকলে।

আর বলবে না-ই বা কেন! সুদাম হাজরার ছেলে আর মেয়ে—গর্ব করবার মতই। মানিক যেমন সুদর্শন, মুকুল তেমনি সুন্দরী, তেমনি তার মুখশ্রী। টিকলো নাক, টানা-টানা চোখ, কোঁকড়া-কোঁকড়া পিঠভর্তি চুল, আর যেমন গড়ন তেমনি বরণ। সেই কিশোরী রূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুদাম হাজরা ভাবত, মাকে আমার সেরা ঘরে সেরা বরে পাত্রস্থ করব। আর মুকুলের মা—পাড়াপড়শীর মুখে যার নাম ছিল পলাসনের বউ—ভাবত, মেয়ের বিয়েতে হয়ত জমিজমা বেচতে হবে না আর-পাঁচজনের মত।

অবশ্য বেচবার মত জমিজমা তখন আর বিশেষ নেই। ছিল শুধু মুকুলের মায়ের একগা গয়না। কিন্তু তেমনি আবার ছিল জমিদারির তিন-আনি অংশ, যার অষ্টমের খাজনা মেটাতে গয়নাগুলো বন্ধক রাখতে হত প্রতিবছর। আর ভাদ্র-আশ্বিনে ধানের দর উঠলে মরাই খুলে দিয়ে মরাইতলায় গুনে গুনে টাকা নিয়েই ছুটতে হত কাটোয়ার মহাজনের কাছে বন্ধকী গয়না ফিরিয়ে আনতে। এমনি করেই চলছিল। মানিক-মুকুলের পড়াশুনোর দিকে তেমন নজর ছিল না সুদামের। গাঁয়ের ইস্কুলে নামটাই ছিল তাদের, মন পড়ে থাকত চাষের দিকে। কোন্ জমিতে কতখানি চাপান দিতে হবে, বাকুড়ির জমিতে নিড়েন দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না, পাল্টা মই দিতে হবে কি

না কোথাও, ছেঁচ দেওয়ার পর কাঁদরের জল এসে পড়লে হেজে যাবে কি না সব—এমনি নানান কথা নিয়ে বিজ্ঞের মত তর্ক করত মানিক, আর তা দেখে মনে মনে খুশী হত সুদাম। কী হবে পড়াশুনোয়! তিনটে পাশ দিয়েও তিরিশ টাকা মাইনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে মোড়লদের দু-দুটো ছেলে। আর রায়দের বাড়ির মেয়ে তো কলেজে পড়ছে বোর্ডিংয়ে থেকে, তাতেও কি তার বিয়ের সুরাহা হয়েছে কিছু! ওসব কিছু না, মেয়ের রূপটাই আসল, আর মুকুল দেখতে শুনতে যখন এত সুন্দর পাত্র খুঁজতে বেগ পেতে হবে না, কেউ পণও হাঁকবে না তেমন কিছু।

এমনি সাত-পাঁচ ভাবত সুদাম হাজরা। কিন্তু মুকুলের মত বুদ্ধিমতী মেয়ে যে হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসবে, কোনদিন কল্পনাও করে নি কেউ। না সুদাম, না পলাসনের বউ—অর্থাৎ মুকুলের মা।

দোষ নেই মুকুলের। সাত বছর বয়স—গায়ে কোনরকমে শাড়িটা জড়িয়ে-মড়িয়ে বেড়ায়, খেলাধুলো ছেলেদের সঙ্গে, ডাঁর ফেলে মাছ ধরে, গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, সে কি করে বুঝবে অতশত!

পাশের গাঁ ক্ষীরগাঁ। যোগাদ্যার মেলা হয় প্রতিবছর। জাঁকালো মেলা, দোকানী আসে দূর দূর দেশ থেকে। শাস্ত্রে আছে যোগাদ্যা হল বাহান্ন পীঠস্থানের একটি, বিশ্বাসীরা বলে পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি। মা-কালী স্বয়ং নাকি পূজারীর মেয়ে সেজে শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা নিয়ে পরেছিল।

ক্ষীরগাঁয়ের মেলা যাবার তাই বড় সাধ মুকুলের। মুকুল আর মানিকের। বায়না ধরেছে বাপ-মার কাছে। কিন্তু নিয়ে যেতে রাজী হয় নি সুদাম হাজরা: মেলার ভিড়ে নিজেরাই রাস্তা হারিয়ে ফেলি, তোরা যাবি কী করে!

ভিড়! কী এমন ভিড়, লোক যায় না মেলা দেখতে!

দুপুরবেলা মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে মায়ের পাশেই শুয়ে ছিল মুকুল আর মানিক। তক্তাপোশের ওপর বাবা।

মিটিমিটি তাকিয়ে দেখল মুকুল। হ্যাঁ, বাবা মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মানিককে একটা ঠেলা দিয়েই গুটিগুটি বেরিয়ে এল। এসে একেবারে বাঁশ-ডোবার ধারে কঞ্চি-ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল।

মানিক আসতেই বললে, যাবি?

—কোথায়? চোখ বড় বড় করল মানিক।

মুকুল ফিসফিস করে বললে, ক্ষীরগাঁ। মেলায়।

—চ। খুশিতে নেচে উঠল মানিকের চোখ দুটো।

ব্যস। দু ভাইবোন ছুটতে ছুটতে চলল দুপুরের রোদে, রোদে-তাতা আল ধরে।

নাকের সোজা চলে গেলেই একটা কাঁদর। জল নেই এখন কাঁদরে। সেটা পার হয়ে বাঁ দিকে ফিরলেই চালা দেখা যাবে সারি সারি।

—রাস্তা ভুল করিস নি তো দিদি? অনেকখানি এসেও কাঁদরের দেখা মিলছে না বলেই জিজ্ঞেস করল মানিক।

—না রে, না। ক্ষীরগাঁর আবার রাস্তা!

যেন সব জানে মুকুল, দু বছরের বড় বলেই জানে!

না, রাস্তা ভুল হয় নি। কাঁদর পার হতেই দেখল, বোর্ডের রাস্তা ধরে লোক চলেছে সারি সারি। মাথায় করে জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে অনেকে। একটা সাঁওতালের দল, মেয়েই বেশী।

মুকুল এবার জিজ্ঞাসা করল তাদের, মেলা কোন্ দিকে গো?

—এই মা গো! খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, পরক্ষণেই

দলের সকলকেই উদ্দেশ করে হাসতে হাসতে বললে, অরে, এ দুধ পায়রা রঙের নাড়ু দুটা মেলাকে যাবে।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে মুকুলকে আবার প্রশ্ন করলে, মেলাকে যাবি ?

—হ্যাঁ, যাব ত। একটু বিরক্ত হয়েই মুকুল বললে।

মেয়েটা আবার হেসে উঠল ঃ চ কেনে সাথে সাথে।

সাঁওতাল দলটার সঙ্গে সঙ্গে এসে মেলায় পৌছল দুজনে। এসে দেখল, ভিড় সত্যিই। ঠেলাঠেলি, ছোটাছুটি, চিৎকার। এতক্ষণে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল মুকুলের। হারিয়ে যাবার ভয়। শক্ত করে মানিকের হাতটা ধরল, ছাড়াছাড়ি না হয়।

নাগরদোলা ঘুবছে তখন বন বন করে। যত দোকান, তত লোক। ভাজা পাঁপর আর তেল-ফুলুরির গন্ধ ভুরভুর করছে। সাঁওতালের দল পেলেই হাত ধবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সার্কাসওয়ালা। বাঘের খেলা দেখাতে। সার্কাসওয়ালার হাত ছাড়িয়ে আসতে না আসতে ধবেছে চুড়িওয়ালা। সাবি সারি চুড়ির দোকান—কাচের চুড়ি রঙবেরঙের। তার পাশেই সোনার। সত্যি সোনার নাকি ? একবার কী ভাবলে মুকুল। না, নকল সোনা বোধ হয়। ওদিকে ওটা ? শাঁখার দোকান! শাঁখার দোকানই বেশী। শাঁখা পরতেই আসে সকলে। এ গাঁয়ে শাঁখা পরতে এসেছিল মা-কালী স্বয়ং। শাঁখারী 'শাঁখা চাই', 'শাঁখা চাই' বলে শাঁখা ফিরি করে যাচ্ছিল। একটা কালো মেয়ে এসে বললে, দাও পরিয়ে।

হঠাৎ একটা ভিড়ের চাপে হাত ছেড়ে গেল মানিক আর মুকুলের।

মানিক ভয়ে চীৎকার করে উঠল, দিদি !

কোনও সাড়া পেল না। কোন্ ফাঁকে সাঁওতালের দলটাও ছেড়ে এসেছে। হঠাৎ দু চোখ ছাপিয়ে জল এল মানিকের। ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। সমস্ত মেলাটাই এতক্ষণ কিনতে

ইচ্ছে হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে, মেলা নয়—যেন একটা বিভীষিকা। কই, দিদি কই ? দিদি, দিদি ! চীৎকার করল মানিক।

—ও খোকা পুতুল কিনবে, পুতুল ?

কথাটা শুনেও শুনল না মানিক, ফিরেও তাকাল না। গেরুয়া-কাপড়-পরা হাতে-চিমটে সন্ন্যেসীর দলটা পার হয়ে যেতেই মুকুলকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হেসে উঠল মানিক। মুকুলের চোখ থেকেও উৎকণ্ঠা দূর হল। এই দলটা মাঝখানে এসে পড়াতেই দুজনে দুজনকে হাবিয়ে ফেলেছিল।

মুকুল ধমক দিয়ে বললে, বললাম—হাত ছাড়িস না, হাত ছাড়িস না।

অপরাধীর চোখে তাকাল মানিক। সে যে ইচ্ছে করে হাত ছাড়ে নি, লোকগুলোর ধাক্কা সহ্য করতে না পেরেই হাত ছেড়ে দিয়েছিল সে-কথা যেন ভুলেই গেছে দিদিটা।

মুকুল ততক্ষণে পুতুলের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কত রকমের পুতুল ! কোনটা ঘাড় নাড়ছে দুলে দুলে, দু হাত তোলা নিতাই-গৌর, বাইজীর মত ঘাগরা পরে কোনটা।

পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুকুল আর মানিক, আর খিলখিল করে হেসে ওঠে। কাছে এগিয়ে যায়, নেড়ে-চেড়ে দেখে, তারপর মনে পড়ে যায়—একটাও পয়সা নেই কাছে, বিমর্ষ-মুখে সরে আসে।

একটা দোকানে নানান ধরনের রান্নার জিনিসপত্র, আর কি সুন্দর দেখতে সেগুলো ! খুন্তি সাঁড়াশি বাসনকোসন চালুনি—আর কী চমৎকার চাকি-বেলুন ! মুকুলের মনে পড়ল, বেলুনটা খারাপ হয়ে গেছে। পয়সা থাকলে—

না, লোকটা পয়সার বদলে চালও নিচ্ছে ওজন করে। এক সের চালও যদি নিয়ে আসত আঁচলে বেঁধে ! তা হলে চাকি-বেলুনটা

নিয়ে যেত, আর তা দেখে মা খুশী হত, মেলায় গিয়েছিল, শুনলে বড়-জোর একটা ধমক দিত।

ঘুরতে ঘুরতে আবার একটা শাঁখার দোকানের সামনে এসে পৌঁছল ওরা।

হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই কেমন ভয়-ভয় করছিল মানিকের। বললে, দিদি, বাড়ি চ।

—দাঁড়া না। বলে শাঁখার দোকানের কাছে এগিয়ে গেল মুকুল।

বউটাকে শাঁখা পরাতে পরাতে গল্প বলছে শাঁখারী: 'হ্যাঁ, মা, এখানেই কালো মেয়ে শাঁখা পরে বলেছিল—যা, বাবার কাছে দাম নিবি। বলে দেখিয়ে দিয়েছিল পুজুরীর বাড়ি। পুজুরী শুনে বিশ্বাস করলে না, বললে—'মেয়েই নেই আমার।…'

এ গল্প মুকুল জানে, সরে এল ও। ও-দিকটায় এত ভিড় কিসের দেখতে হবে তো। ভিড়ের দিকেই এগিয়ে চলল।

মানিক ধীরে ধীরে বললে, তারপর কী হল রে দিদি?

—ওমা, জানিস না? পুকুরের পাড়ে এসে যেই পুজুরী জিজ্ঞেস করল—কই গো মেয়ে, কেউ শাঁখা পরেছ? অমনি পুকুরের মাঝখান থেকে একখানা শাঁখা-পরা হাত…

সাঁওতালের একটা দল ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। কথা শেষ হল না মুকুলের। তার আগেই ওরা দুজনে লোকটার সামনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

কোন রকমে সামলে-সুমলে উঠে দেখলে, লোকটার সামনে মাটির ওপর সুন্দর সুন্দর সব ছবি বিছানো রয়েছে। পটো বোধ হয়! না, ভাল করে দেখলে মুকুল—পটুয়া নয়। একটা যন্ত্র দিয়ে মেয়েটার হাতে ছবি এঁকে দিচ্ছে লোকটা। দাঁড়িয়ে দেখে মুকুল। যত দেখে ততই অদ্ভুত লাগে। কেমন একটা নেশা ধরে যায়।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে, তার হাতের যন্ত্রটার দিকে।

ছোট মামা একবার মুকুলের হাতে কালি দিয়ে নাম লিখে দিয়েছিল। সে নাম জলে ধুতেই উঠে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটা বলছে, এ ছবি নাকি কোনদিন উঠবে না। যার যে-ছবি পছন্দ তাই এঁকে দেবে।

একে একে ভিড় কমে এল। কেউ খানিকটা দেখে সরে গেল, কেউ বা উলকি আঁকিয়ে নিয়ে গেল। সবাই তারা হাসছে, খুশী হয়েছে, সকলের মুখেই কী-লজ্জা কী-মজা ভাব।

অপেক্ষা করতে করতে যখন সকলেই চলে গেল, তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মুকুল আর মানিক।

উলকিওয়ালার চোখ পড়ল এতক্ষণে। বললে, কী খুকী, উলকি আঁকাবে নাকি?

—হ্যাঁ। ঘাড় কাত করে হাতটা বাড়িয়ে দিল মুকুল।

উলকিওয়ালা প্রশ্ন করলে, কোন্‌টা দেখিয়ে দাও।

সামনের ছবিগুলো থেকে যে-কোন একটা পছন্দ করে বাছতে বললে।

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলে মুকুল। তারপর বললে, না, ও-ছবি নয়। ফিক করে হেসে ফেলে বললে, মানিকের ছবি এঁকে দাও, আমার ভাই মানিক—ওর মুখ এঁকে দাও।

উলকিওয়ালা বললে, দু আনা লাগবে।

—দু আনা! হতাশ সুর ফুটল মুকুলের গলার স্বরে। যেন হাতের গ্রাস চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

মুকুল প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, আমার কাছে যে পয়সা নেই!

—পয়সা নিয়ে এস বাড়ি থেকে।

বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে আসবে? কোথায় পাবে পয়সা? ফিরে গেলে আর কি আসতে পাবে? কিন্তু হাতে উলকি আঁকতে না পারলে যেন জীবনই ব্যর্থ। মনে নেশা ধরে গেছে তখন মুকুলের। উলকি আঁকবার জন্যে সবই যেন করতে পারে।

মানিক একবার শুধু বললে, দূর, ও-সব করে কী হবে রে দিদি!

—তুই চুপ কর্ তো। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল মুকুল।

তারপর অনুনয় করতে শুরু করল উলকিওয়ালাকে। চোখ ছাপিয়ে জল এল।

বললে, তুমি তো অনেক পয়সা পেয়েছ, এমনি করে দাও না আমাকে। শুধু এক হাতে করে দাও।

উলকিওয়ালা মাথা নাড়ল বার বার।

শেষে হতাশ হয়েই মানিকের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে চলে এল মুকুল। মুখে চোখে রাগ উপচে পড়ছে যেন।

দু পা আসতেই ডাক শুনতে পেল।

—ও খুকী, শোন, দিচ্ছি করে, এস।

উলকিওয়ালার মন নরম হল বোধ হয়। কিংবা তার মনও হয়তো উলকি আঁকার জন্যে ছটফট করছিল। সারাদিন ত কালো কালো হাতে গলায় পায়ে উলকি এঁকেছে সে। এমন ফরসা ধবধবে সোনার মত রঙের হাত ত পায় নি।

উকিওয়ালার ডাক শুনেই ফিরে এল মুকুল। সুডোল নিটোল ফরসা হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, মানিকের মুখ হয় যেন।

হবে, হবে।—সান্ত্বনা দিল উলকিওয়ালা। তারপর যন্ত্রটা হাতে নিয়ে শুরু করল ছবি আঁকতে।

বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে, সারা হাত চিনচিন করছে, টাটিয়ে উঠেছে যেন কাঁধের কাছটা, তবু আনন্দে ফুর্তিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছে মুকুল।

শেষ অবধি একটা মুখ আঁকা হয়ে গেল তার হাতে। খুশী মনে মেলা থেকে বেরিয়ে বোর্ডের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল দুজনে। বোর্ডের রাস্তা থেকে কাঁদরের জল। তারপর দেবীপুরের মাঠ।

আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটু একটু করে ভয় উঁকি দিতে শুরু করল মুকুলের মনে। ফিসফিস করে ভাই মানিককে বললে, মাকে বলিস না যেন!

—দুর।

'দুর' বলে সব ভয় দূর করতে চাইল বটে মানিক, কিন্তু মুকুলের মনে তখন ক্রমশই ভয় বাড়ছে। মানিক না বললে কি আর জানতে পারবে না মা, দেখতে পাবে না! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। রাস্তার ধারে ধারে আকন্দ ফুটে আছে। বাবলাগাছ থেকে কাঁটা ভেঙে নিয়ে আকন্দর মালা গাঁথল মুকুল, তারপর হাতে জড়াল সেটা, উলকিটা ঢেকে। বাস্, আর-কেউ দেখতে পাবে না, সন্দেহ করবে না।

কিন্তু এত সহজে কি ঢাকা যায়! যা তার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল তা কি চাপা ঢাকা দেওয়া যায়!

বাড়ি ফিরতে ফিরতেই মুকুল বললে, হাতটা বড় টাটিয়েছে রে!

—টাটাবেই তো, তখন তো শুনলি না। বিজ্ঞের মত বললে মানিক। সে বুঝে নিয়েছে যে দিদির জন্যে তাকেও মার খেতে হবে।

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দুজনেই পড়ল একেবারে মার সামনে। তাড়াতাড়ি হাতটা পিছনে লুকাল মুকুল। কিন্তু ও-সবের দিকে চোখ গেল না মায়ের, মুকুলকে দেখতে পেয়েই ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল তার গালে।

—কোথায় গিয়েছিলি? সারা দুপুর টোটো করে কোথায় বেড়াচ্ছিলি?

কোনও উত্তর দিতে পারল না মুকুল। সারা শরীর তখন পুড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে। জ্বর আসছে বোধ হয়। শীত-শীত করছে।

কাঁপুনি দিয়েই জ্বর এল। সন্ধ্যের দিকে জ্বর বাড়ল।

বিব্রত বোধ করল সুদাম হাজরা। ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে এসে মুকুলের হাতটা তুলে জ্বর দেখতে গিয়ে দেখল, কনুই থেকে কবজি অবধি ফুলে উঠেছে। আর—

মানিকের কাছ থেকে সবই শুনল সুদাম, শুনল পলাসনের বউ। শুনে ছি ছি করে উঠল।

—ছি ছি! এ কী করলি তুই? ভদ্রঘরের মেয়ে হাতে উলকি আঁকিয়ে এলি শেষে? ছি ছি!

কেঁদে ফেললে বাপ-মা দুজনেই। তাদের সব আশা ভরসা, সব স্বপ্ন যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

হাতে উলকি দেখলে যে বিয়ে করতে রাজী হবে না কেউ! টাকা দিয়েও যে পার পাওয়া যাবে না!

টাকা দিয়েও যেখানে পাব পাওয়া যায় না, প্রতারণাই সেখানে একমাত্র পথ। তেবো বছর পার না হতেই মুকুলের লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা মাথায় বাড়ল চড়চড় করে, শরীর ফাঁপল আঁটসাঁট হয়ে। সুন্দর তো ছিলই, যৌবনের স্পর্শে আরও রূপময়ী হয়ে উঠল।

এ-গাঁ ও-গাঁ ছোটাছুটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত বিয়েও ঠিক করে ফেলল সুদাম হাজরা।

বাবলাডিহির বলরাম সামন্তর ছেলে নিরঞ্জনের সঙ্গে। বলরাম এল, কনে দেখল, পণাপণ ধার্য হল, দিনও ঠিক হয়ে গেল।

মুকুলেব দু হাতে দুটো চওড়া মানতাসা পরিয়ে মেয়ে দেখানো

হয়েছিল, বিয়ের পর বিদায় দেবার সময় মেয়েকে কাছে ডেকে মা কানে কানে বললে, মানতাসা যেন খুলিস না কারুর সামনে।

মুকুল ফিক করে হেসে ফেলেই ঘাড় নাড়ল। মনে মনে ভাবল, মায়ের যত মিথ্যে দুর্ভাবনা। হাতে একটা উল্কি আছে তো কী হয়েছে, শখ করে কেউ করায় না!

মনে মনে বলল বটে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না নিরঞ্জনকে।

দু-একদিন বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত সাহস হয় নি। সাহস যেদিন হয়েছে সেদিন সুযোগ জেটে নি। আর সুযোগ পাবেই বা কী করে!

ভোর না হতেই, নিরঞ্জনের ঘুম না ভাঙতেই উঠে আসতে হয় বিছানা ছেড়ে। ননদ আর শাশুড়ীর কাছে কাছেই সারাটা দিন কেটে যায়। দুপুরে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয় কদাচিৎ, তাও দু-দশ মিনিটের জন্যে। আর রাত্তিরে যখন সংসারের কাজকর্ম সেরে শ্বশুরের তামাক সেজে দিয়ে শাশুড়ীর পায়ে তেল মালিশ করে শুতে আসে, নিরঞ্জনের তখন মাঝরাত্রি। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ক্লান্ত মানুষটা পড়ে পড়ে ঘুময়। এরই মাঝে যেটুকু কথা বলা যায়, যেটুকু ফিসফিসানি, তাও কি নষ্ট করা যায় উলকির কথা তুলে?

কিন্তু না বলে যেন শান্তি পায় না মুকুল। মুকুল? না, ও-নামটা যেন ভুলেই গেছে ও। সবাই ডাকে দেবীপুরের বউ বলে। সবাই সম্মান করে, সম্ভ্রম দেখায়। পাড়ার লোক সামন্ত-গিন্নীকে বলে," দেবীর মতই বউ হয়েছে তোমার দেবীপুরের বউ।

আর পূর্ণিমার রাত্রে এক ফালি আলো যখন এসে পড়ে দেবীপুরের বউয়ের ফরসা মুখখানার ওপর, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিরঞ্জন, ফিসফিস করে বলে, এত রূপ তোমার!

কৌতুকে আনন্দে হাসে দেবীপুরের বউ। কিন্তু বুক দুরদুর করে। এক-একবার ভাবে, বলে ফেলি উল্কির কথাটা। আর-কেউ

না জানুক, স্বামী অন্তত জানুক। কিন্তু পারে না। কেমন একটা ভয়, কেমন একটা আতঙ্ক উঁকি দেয় মনে।

কিন্তু না বলেও যেন শান্তি নেই। দিনরাত মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতুনি, দিনরাত কেমন একটা গা-সিরসির আতঙ্ক। কখন বুঝি শাশুড়ী শুনতে পায়, কখন ননদরা দেখতে পায়! তার চেয়ে নিজের থেকেই বলে ফেলবে সে নিরঞ্জনকে।

না, মুখে বলতে পারবে না। তার চেয়ে নিজের চোখে দেখুক। নিরঞ্জন নিজেই জিজ্ঞেস করুক। যা সত্যি তাই বলবে ও।

দুপুরের খাওয়ার পর খাটের পাশে এসে দাঁড়াল ও। বিছানায় শুয়ে তারই অপেক্ষায় বুঝি দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল নিরঞ্জন। বললে, পান দেবে না?

—পানের জন্যই বুঝি ঘুমোও নি! বলে কৌতুকে হাসল দেবীপুরের বউ।

তারপর হাতের মানতাসা চুড়ি গলার হার খুলে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল। বললে, বড় ঘুম পাচ্ছে।

বলে চোখ বুজে পড়ে রইল। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস দ্রুত হচ্ছে, এখনই বুঝি চমকে নিরঞ্জন প্রশ্ন করবে! তবু সেই প্রশ্নটাই যেন শুনতে চায় দেবীপুরের বউ। শান্তি পেতে চায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে চোখ খুলল। না, হাতের দিকে উলকির দিকে দৃষ্টি নেই নিরঞ্জনের। একদৃষ্টে তার মুখের দিকেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে শুধু।

উঠে পড়ল দেবীপুরের বউ। ঘরের কোণে পানের বাটা আছে কুলুঙ্গিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান সাজল। পান নিয়ে দাঁড়াল নিরঞ্জনের সামনে। হাত বাড়িয়ে পান দিল। তবু নিরঞ্জনের চোখে পড়ল না উলকিটা।

আর হঠাৎ কেমন সারা গা শিউরে উঠল দেবীপুরের বউয়ের।

শুয়ে পড়ার ভান করে পাশ ফিরে লুকিয়ে লুকিয়ে বালিশের তলা থেকে মানতাসা বের করে হাতে পরল, উলকি ঢাকল। কী আশ্চর্য! নির্বোধের মত কেন সে নিজের কলঙ্ক নিজেই তুলে ধরতে চাইছিল স্বামীর চোখের সামনে !

এত যে ভালবাসা মান অভিমান—সব-কিছুই হয়ত মুছে যাবে মুহূর্তে, কে বলতে পারে !

এক-একদিন হঠাৎ যেমন তুঃসাহসে এগিয়ে আসে দেবীপুরের বউ, তেমনি এক-একদিন ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে ওর।

সেই সেদিনের মায়ের সজল চোখের ধিক্কারটা যেন কানের পাশে বেজে ওঠে বার বার।—ছি ছি! কী করলি তুই, ভদ্রঘরের মেয়ে হতে হাতে উল্কি আঁকিয়ে এলি শেষে ?

যত দিনের পর দিন কেটে যায়, দেবীপুরের বউ ততই বুঝতে পারে তার এই নির্দোষ কলঙ্কটুকুও স্বামীর সামনে তুলে ধরার সুযোগ চলে যাচ্ছে, সাহস কমে যাচ্ছে।

মন এক-একদিন আনন্দে ভরে ওঠে, মনে রোমাঞ্চ জাগে, নিজেই কৌতুকে এগিয়ে যায় নিরঞ্জনের কাছে, তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে স্বপ্নের মত ভাঙা ভাঙা কথা বলে, কিন্তু তারপরই—যখনই নিরঞ্জনের তুটি হাত আলিঙ্গনের উচ্ছ্বাসে এগিয়ে আসে, নিরঞ্জনের চোখ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে আবেগে, তখনই কেমন যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে দেবীপুরের বউ, সমস্ত শরীর তার অবশ হয়ে যায়। হঠাৎ কোথা থেকে একটা আশঙ্কার কুয়াশা এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। আয়নার প্রতিচ্ছবি যেমন হাতে হাত ঠেকে, মুখে মুখ, অথচ কোন স্পর্শের অনুভূতি জাগে না, তেমনি তুজনে কাছে থেকেও যেন দূরে। নিরঞ্জনকেও কেমন যেন আশাহত বেদনার মত মনে হয়। বিস্ময়ের অতৃপ্তির চোখ তুলে তাকায়। সে কী যেন খোঁজে, কী যেন খোঁজে! মনে হয়, কী যেন এক অজানা রহস্যের পাঁচিল গাঁথা হয়ে যাচ্ছে

দুজনের মাঝখানে। দুটি দেহ কাছাকাছি এসেও রয়ে গেছে অনেক দূরে। মন দূরে সরে গেছে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন আতঙ্কে শিউরে উঠল দেবীপুরের বউ একটি ঘটনায়। দিনের পর দিন কত ঘটনাই তো ঘটছে, এই সামন্ত-বাড়ির বউ হয়ে আসার পর থেকে অনেক কিছুই দেখছে। কখনও দেখছে শ্বশুর-শাশুড়ীর রুদ্র মূর্তি, কখনও কোমল স্নেহ, কিন্তু এমন একটা ঘটনা যে তারই চোখের সামনে ঘটবে তা বুঝি কল্পনাও করে নি সে।

বাবলাডিহির বলরাম সামন্তর পুত্রবধূ হয়ে এ-বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকার পর থেকে অনেক কিছুই দেখছে সে, অনেকবার আতঙ্কিত হয়ে উঠছে, কিন্তু বুকে গিয়ে বেঁধে নি কোনদিন।

অথচ এ-বাড়িতে মাথায় লাল বেনারসীর আঁচল টেনে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেদিন এসেছিল, সেদিন শুধু যৌবনের রোমাঞ্চই নয়, স্বামী-গৃহের গৌরবেও গর্বিত হয়েছিল সে। সামন্তদের সংসার তখন জমজমাট। অবস্থা চারপাশের গাঁয়ের পাঁচটা হাঁকডাকের জমিদারের দশগুণ। রাশভারী লোক্ ছিলেন বলরাম সামন্তর বাপ, সদরে মামলা করতে যাবেন অপরের জমির ওপর দিয়ে, মাঝপথে দেখলেন কাঁদরের বাঁধ কেটে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে জমি। বুঝলেন, অপর পক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে হয়েছে কাণ্ডটা। ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন, সদরে যদি কোনদিন যাই তো নিজের জমির ওপর দিয়ে যাব। প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারেন নি তিনি নাকের সোজা সাত শো বিঘে জমি কিনেও। বাপের ইচ্ছা পূরণ করেছিল পুত্র বলরাম সামন্ত। সামন্তদের খামার ছিল চোখ চেয়ে দেখবার মত। মরাইয়ের পর মরাই বিঘে পনেরো জমি জুড়ে, দূর থেকে চিকচিক করত খড়ের ছাউনি, লোকে গ্রাম বলে ভুল করত। আর সেই মরাই খোলা হত কালেভদ্রে,

কিস্তির সময় গাঁয়ের পাঁচটা খামার যখন খাঁ-খাঁ করত, মরাইয়ের 'বড়ে' হাত পড়ত না তখনও সামন্ত-বাড়িতে।

গাঁয়ের লোকে বলত, চাল যে খারাপ হয়ে যাবে বড় কর্তা, ক বছর আর ধরে রাখবেন? দাম চড়েছে, দিন এবার বেচে।

বলরাম সামন্ত হেসে বলত, বেচে দেবার চাল ওই মাঠে খামারে। এ আমার ঘরে খাবার বাসমতী। পাঁচ বছরের পুরনো হলে তবে খুলব।

লোকে বিস্মিত হয়ে তাকাত বলরামের মুখের দিকে।

আর বলরাম হাসতে হাসতে বলত, যার যা নিয়ম। স্থতোর মত সরু আর গ্যাঁড়া-গ্যাঁড়া দেখতে, কিন্তু ভাত হবে একেবারে সীতাভোগ, যেমন লম্বা তেমনি বড়। আর বাস কী তার, এস না, আজ তুপুরে এখানেই নয়—

তা কৃপণ ছিল না বলরাম, সুযোগ পেলেই গাঁ-শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করে বসত। যার বাড়িতেই কুটুম আস্থক, সামন্ত-বাড়িতে এক বেলা খেয়ে যেতেই হবে। দিঘির মত পুকুর সব, গোয়াল-ভরা গাই।

এমনি ভরভরন্ত সময়েই তার ছেলে নিরঞ্জনের বউ এসেছিল—দেবীপুরের বউ। এসে দেখলে, অষ্টমের খাজনা মেটাতে গিন্নীর গয়না বন্ধক রাখতে হয় না, ধানের দর জলের মত হলেও মরাই খুলতে হয় না।

প্রথম প্রথম তাই খুশীই হয়েছিল দেবীপুরের বউ। আনন্দে নেচে উঠেছিল তার মন। কিন্তু তু দিন না-যেতেই বউয়ের গয়না-পত্তর দেখে নাক বেঁকাল সামন্ত-গিন্নী।

তু গালে তু জোড়া পান গুঁজে এক মুঠো দোক্তা মুখে পুরে বউয়ের গলার হারটা নেড়েচেড়ে বলেছিল, এ কী হার গো বউমা, এ যে মুড়কিমালা, পাটকরুনী বাগদী-বউয়ের ছেলের মুখে-ভাতে দিয়েছিলাম।

শুনে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল দেবীপুরের বউ। চোখ ঠেলে জল এসেছিল তার। মনে মনে ভেবেছিল, এর চেয়ে গরিবের ঘরে হলেও শান্তি পেত সে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভয় পেত বাড়ির সবাই। সবচেয়ে বেশী ভয় পেত দেবীপুরের বউ।

কিন্তু নিরঞ্জনের ব্যবহারে খুঁত ছিল না। নিরঞ্জনের ব্যবহারে অনেক-কিছু ভুলতে পেয়েছিল সে, অনেক-কিছু ক্ষমা করতে পেরেছিল।

শুধু ভুলতে পারে নি একটি কথা।

তাব হাতের উলকির কথা—যে কলঙ্ক সে গোপন রাখতে চেয়েছে, দিনের পর দিন, যে কলঙ্ক তার গোপন মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। যা গোপন করতে গিয়ে নিরঞ্জনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে সে, সব রঙ গেছে তার চোখ থেকে।

সেই উৎফুল্ল যৌবনের কৌতুক-ছন্দে-গড়া কোমল শরীরটা যেন দিনে দিনে বিষাদক্লিষ্ট অভিশপ্ত অহল্যায় পরিণত হয়ে চলেছে তখন।

এমনি সময়েই ঘটনাটা ঘটল তার চোখের সামনে।

ঝাংলাই-পূজোর সময় একান্নবর্তী সামন্ত-পরিবারের সবাই ফিরে আসে গাঁয়ে। ভায়াদ সম্পর্কের ছেলে-বউরা,বউ-ঝিরা, মেয়ে-জামাইরা—সকলে এসে হাজির হয়। তাই রান্নার জন্য সে-সময় আনা হয় কয়েকজন রাঁধুনী।

হঠাৎ চিৎকার শুনে সেদিন ছুটে এসে দেবীপুরের বউ দেখলে, রাঁধুনী বামনীদের একজন সাদা থান কাপড়ের ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে উঠনে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর চিৎকার করছে সামন্ত-গিন্নী।

—কী হয়েছে মা? এসে জিজ্ঞেস করল দেবীপুরের বউ।

আর সে-প্রশ্ন শুনে আবার চিৎকার করে উঠল সামন্ত-গিন্নী। দেবীপুরের বউ শুনল ব্যাপারটা। বামুনের ঘরের বিধবা মেয়ে

পরিচয় দিয়ে সে নাকি এ কদিন রান্নার কাজ করছিল। আজ হঠাৎ শাশুড়ীর চোখে পড়েছে তার চিবুকে উলকির দাগ।

সে যত বোঝাতে চায়, সে বামুনের ঘরেরই মেয়ে, সামন্ত-গিন্নী তত চিৎকার করে।—ছি ছি ছি, বামুনের ঘরের মেয়ের গায়ে উলকি থাকে কখনও? ও নিঘ্‌ঘাত ছোট জাত, নিঘ্‌ঘাত কোন খারাপ বংশের মেয়ে-

ননদরা বোঝাবার চেষ্টা করল। সামন্ত-গিন্নীর তবু সেই স্থির সিদ্ধান্ত: কাটোয়ায় গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখেছি বাপু, বোঝাস না আমাকে, যত সব বেবুশ্যেদের হাতে মুখে উলকি থাকে।

কথাটা শুনেই ছুটে পালিয়ে এল দেবীপুরের বউ। মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরে গেল তার, সারা শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। বিছানায় শুয়ে পড়ল দেবীপুরের বউ, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। ভয়ে আতঙ্কে সারা শরীর তখনও কাঁপছে তার, কাঁপছে লজ্জায় ঘৃণায়।

অনেকক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে উঠল সে। তারপর কোটাল-বউকে ডেকে গোপনে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল দেবীপুরে।

দু দিন পরেই পালকি নিয়ে হাজির হল সুদাম হাজরা।

ছেলের বিয়ের মিথ্যে খবর দিয়ে নিয়ে গেল মেয়েকে।

তারপর আর বাবলাডিঙে ফিরল না দেবীপুরের বউ। অথচ সামন্ত-বাড়ির কেউ কিছু বুঝল না। সবাই ভাবল, নিরঞ্জনের সঙ্গে বুঝি কোন মনোমালিন্য হয়েছে তার। আর নিরঞ্জন খুঁজে পেল না এ রহস্যের চাবি।

বার বার চিঠি লিখেও যখন উত্তর পেল না বলরাম সামন্ত, লোক পাঠিয়েও পুত্রবধূকে ফিরিয়ে আনতে পারল না, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে পাঠাল, ও-বউকে আর ঘরে আনব না।

আর এমনি করেই সাতটা বছর কেটে গেল।

সামন্ত-গিন্নী মারা গেলেন, তার পরে বলরাম সামন্ত।

বাপ-মা মারা যাওয়ার পর শেষ চেষ্টা হিসেবে দেবীপুরে এল নিরঞ্জন, আর নিরঞ্জনের সঙ্গেই বাবলাডিঙে ফিরে এল দেবীপুরের বউ।

কিন্তু তার মাস কয়েক পরেই··

ন্যাংটেশ্বরের মেলা। প্রতি বছরেই এ সময় মেলা বসে বাবলাডিঙে। চারপাশের গাঁ থেকে লোক ভেঙে পড়ে। দূর দূর জায়গা থেকে আসে দোকানীরা, টিকিট কেটে জায়গা নেয়। চালা তোলে, দোকান খোলে।

ন্যাংটেশ্বর শিবের পূজো দিয়ে ভোগের থালাটা হাতে করে ফিরছেন দেবীপুরের বউ। পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি, দীর্ঘ ঋজু চেহারা, প্রতিমার মত সুগঠন সুন্দরী, টিকলো নাক, টানা-টানা চোখ, ফরসা ঝকঝকে মুখে কপালে ঘামের বিন্দু, নাকের ডগাটা লাল হয়ে আছে।

দোকানগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতেই ফিরছিল দেবীপুরের বউ। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে—লোকটার দিকে চোখ পড়তেই থেমে পড়ল।

একটি মুহূর্ত। তারপরই তরতর করে বাড়ি ফিরে ভোগের থালাটা নামিয়ে রেখে ডাকল, মানো!

পাটকর্ণী ঝি সামনে এসে দাঁড়াল।

দেবীপুরের বউয়ের কপালের শিরা দুটো তখন দপদপ করছে। গম্ভীর গলায় বললে, কোটালদের ডাক্ তো একবার।

কেউ কিছু বুঝল না, কেউ কিছু খুঁজে পেল না। শুধু শুনল দেবীপুরের বউয়ের হুকুমে মেলায় একটা উলকিওয়ালাকে পিটিয়ে

মেরেছে কোটালরা। তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, যেতে চায় নি লোকটা, তাই পিটিয়ে মেরেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে এমন থানা-পুলিস মামলা-মোকদ্দমা হবে তা কে জানত! কে জানত দেবীপুরের বউ খুনের আসামী হয়ে দাঁড়াবে।

দেওয়ানী নয়, ফৌজদারী মামলা। প্রধান আসামী দেবীপুরের বউ। নিরঞ্জন ছোটাছুটি শুরু করল—কাটোয়া বর্ধমান, এ-উকিল সে-উকিল। এদিকে লজ্জায় ভয়ে ঘৃণায় সামন্ত-বাড়ি যেন নিঃঝুম হয়ে গেছে। আর সামন্ত-বাড়ির বউ—দেবীপুরের বউ ঘরে খিল দিয়েছে জামিন নিয়ে ফিরে এসে। পাটকরুনী মানোর ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, ভাই-ভায়াদ সম্পর্কের ননদ-জাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত কপাট খুলল দেবীপুরের বউ, ভাই মানিক দেবীপুর থেকে ছুটে এসেছে শুনে।

কপাট খুলে বেরিয়ে এল সে। লজ্জায় গ্লানিতে এই দু দিনে যেন সেই প্রতিমার মত চেহারা ভেঙে পড়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত দৃষ্টি। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

রোদে পুড়ে মাঠ ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসেছে মানিক হাজরা। কিন্তু তার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারল না দেবীপুরের বউ। চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে এসে বারান্দায় একটা আসন পেতে দিল ভাইকে, হাতপাখাটা নিয়ে কলের পুতুলের মত বাতাস করতে শুরু করল।

তারপর মানিকের প্রশ্ন শুনে ডুকরে কেঁদে উঠল দেবীপুরের বউ—কান্নায় ভেঙে পড়ল।

একে একে শুনল মানিক, শুনল সব।

বললে, ভয় নেই, সব কথা শুনলে বোধ হয় ছাড়া পেয়ে যাবি, জজেরও রায় ঘুরে যাবে।

উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে নিরঞ্জনও সেই কথাই বোঝাল। শুধু

তটা বাড়িয়ে উলকিটা দেখাতে হবে, বলতে হবে তার জীবনের
া-বেদনার কাহিনী। বলতে হবে, মেরে ফেলতে বলি নি, মেরে
ড়িয়ে দিতে বলেছিলাম।

শুনল দেবীপুরের বউ। মুখের ভাব এতটুকু বদলাল না!
থাগুলো শুনল কি শুনল না বোঝাই গেল না।

।সময়ে মামলা উঠল আদালতে, দেবীপুরের বউ উঠল কাঠগড়ায়।

তারপর প্রশ্ন শুরু হল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

—উলকিওয়ালাটাকে মারতে বলেছিলেন কোটালদের?

—হ্যাঁ।

—কেন বলেছিলেন?

—রেগে গিয়েছিলাম হঠাৎ।

—কেন রেগে গিয়েছিলেন?

উত্তর নেই। উকিলের প্রশ্নের জবাবে কোনও উত্তর দিচ্ছে না
দবীপুরের বউ। চুপ করে আছে।

নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে নিরঞ্জন। নিশ্বাস রোধ করে বসে
াছে মানিক। আর বিভ্রান্তের মত তাকাচ্ছে উকিল। শেখানো
বাবটা কি দিতে পারছে না দেবীপুরের বউ, সত্যি কথাটা বলতেও
ক মুখে অটকাচ্ছে?

—কেন রেগে গিয়েছিলেন বলুন।

বার বার প্রশ্ন করল উকিল, আর দেবীপুরের বউ শেষ পর্যন্ত
ত্তর দিল, সে-কথা আমি বলতে পারব না।

উত্তর শুনে চুপসে গেল সব আশাভরসা।

শুনানির দিন পড়ল আবার। আর বেরিয়ে আসতে আসতে
ানিক প্রশ্ন করল, কী হল, উত্তর দিলি না কেন? উলকি দেখালি
। কেন? তা হলেই ত জজের রায় ঘুরে যেত।

হাসল দেবীপুরের বউ। বিষণ্ণ হাসি।

বললে, কী যে বল! একঘর লোকের সামনে দেখাব হা
উলকি আছে আমার? কী ভাববে বল ত? হয়ত খারাপ কি
সন্দেহ করবে, হয়ত—না, না, তার চেয়ে যা খুশী রায় দিক
জজ, যা খুশী—

যা খুশীই হয়তো রায় দেবে এই ছোট্ট আদালতের জজ, কি
আরও বড় জজের এজলাসে—সবচেয়ে বড় জজের এজলাসে হ
অন্য রায় পড়া হবে। রায় পড়বেন সেই সবচেয়ে বড় আদাল
জজ, হয়তো বলবেন, এই আর-একটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ পাও
যাচ্ছে যে, মানুষের একদিনের কামনা আর-একদিন কলঙ্ক হয়ে দে
দেয়, আর সেই কলঙ্ক গোপন করতে গিয়ে মানুষ আরও অনে
কলঙ্কের বোঝা··